দারসে কুরআন

১

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন
১ম খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.pathagar.com

দারসে কুরআন ১ম খন্ড
প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৯৯ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ, ২০০৫ সাল
১৫ তম মুদ্রণ ঃ নভেম্বর - ২০১১ সাল
ঃ অগ্রহায়ণ-১৪১৮ সন
ঃ জিলহজ্ব-১৪৩২ হিজরি
সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।
প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮/১, খানজান আলী রোড, খুলনা।
অক্ষর বিন্যাস ঃ দি লিমা ইন্টারপ্রাইজ
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা।
মুদ্রণে ঃ ঈগল অফ্‌সেট প্রেস
৩০, খানজাহান আলী রোড,
শক্তিধাম মোড়,খুলনা।
নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা
পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (মালিক)
০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

কুরআন মহল, সিলেট।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	তাসনিয়া বই বিতন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	আহসান পাবলিকেশন, মগবাজার,ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১. দারসে হাদীস-১ম খন্ড
২. দারসে হাদীস-২য় খন্ড
৩. দারসে কুরআন-১ম খন্ড
৪. দারসে কুরআন -২য় খন্ড
৫. দারসে কুরআন -৩য় খন্ড
৬. দারসে কুরআন - ৪র্থ খন্ড
৭. নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক হাদীস
৮. ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
৯. আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
১০. রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
১১. বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
১২. বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
১৩. কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্মসূচী
১৪. ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার)মর্যাদা

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মহানবী (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের উচিত আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী ব্যবহারিক জিন্দেগীতে প্রয়োগ করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কুরআনের আসল স্পীরিটকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজের মানুষকে সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে-আল-কুরআনের বিধান মানতে হলে কুরআনের আসল বুঝ থাকা জরুরী। আল-কুরআনের আসল বুঝ দেবার জন্যই আমি কুরআনের বাছাই করা কতগুলো অংশ থেকে "দারসে কুরআন" বইটির প্রথম খন্ড প্রকাশ করলাম। যার সহযোগিতা নিয়ে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে মসজিদে মসজিদে অথবা কোনো মজলিসে দারসে কুরআন প্রদানের মাধ্যমে তার সঠিক শিক্ষা সহজে পৌছিয়ে দিতে পারেন।

আমি "দারসে কুরআন" বইটি ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া বইটির প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয়ও উল্লেখ করেছি। বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন বইটি লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি পরামর্শ এবং অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের শোকরিয়া আদায় করছি এবং আল্লাহ পাকের কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির কাছে ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে কিংবা পরামর্শ থাকলে আমাকে জানালে তা কল্যাণ মনে করে ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের কাছে আমার আরজি, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে গিয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তাহলে তুমি মেহেরবাণী করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করো এবং আখেরাতে আদালতে একে আমার জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিও। আমিন!

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
অনুপ্রেরণা দানকারী আমার শ্রদ্ধেয়
মরহুম আব্বা-আম্মা আর যারা শহিদী
নজ্‌রানা পেশ করেছেন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
○ দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি		০৭
○ দারসের সময় বন্টন		১১
○ দারস দানকারীর করণীয়		১৩
○ দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা		১৫
○ এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়		১৮
○ মুত্তাকীনদের গুণাবলী	(সূরা বাকারা-১-৫)	১৯
○ মু'মিনদের গুণাবলী	(সূরা মুমেনুন-১-১১)	৩৩
○ বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার	(সূরা নূর-২৭-২৯)	৫৭
○ ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়	(সূরা আল আসর)	৭১
○ কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়	(সূরা সফ্-১০-১৩)	৮৪
○ মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ	(সূরা নিসা-৭৫-৭৬)	৯৩
○ ঈমানের পরীক্ষা	(আলে ঈমরান-১৩৯-১৪১)	১০৩
○ সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যাদা	(সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৬)	১১৩
○ মরণের আগেই আল্লাহ্‌র পথে অর্থ খরচ	(সূরা মুনাফিকূন-৯-১১)	১২৫
○ কিয়ামতের দৃশ্য	(সূরা হজ্ব-১-২)	১৩৯
○ আনুগত্য-তাকওয়া ও মজবুত ঈমান এবং তার প্রতিদান	(সূরা আনফা'ল-১-৪ আয়াত)	১৪৮

২য় খন্ডে যা আছে

- ○ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। (সূরা আলাক-১-৫)
- ○ মুমিনের জেন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জেন্দেগী। (সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)
- ○ মুমিন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য (সূরা তাওবাহ-১১১-১১২)
- ○ মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ। (সূরা হুজুরাত-১১-১২)
- ○ দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্ক বাণী। (সূরা তাকাছুর-১-৮)
- ○ ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী। (সূরা মায়েদাহ-৫৪-৫৬)
- ○ আল্লাহর কতিপয় কুদরাত ও নেয়ামত। (সূরা আন নাবা-১-১৬)
- ○ মুনাফিকদের আচরণ। (সূরা বাকারা-৮-১৬)

৩য় খন্ডে যা আছে

- ○ জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)
- ○ কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব। (সূরা নহল-৯০-৯৭
- ○ অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ (সূরা শু'রা ১৩-১৬)
- ○ ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে (সূরা আলকাবুত-১-৭)
- ○ আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াতদান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। (হা-মীম-আস-সাজদাহ-৩০-৩৬)
- ○ দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না (আনয়াম-৩৩-৩৬)
- ○ স্ত্রী, সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)
- ○ আখেরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ (সূরা মাউন)

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দারসে কুরআন-এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি

আসমানী কিতাব আল-কুরআন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে জীবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। কুরআনের এই বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে। সুতরাং এই কুরআনকে বুঝা এবং তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা আমাদের অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। কিন্তু সমস্যা হলো আল কুরআনের ভাষা আরবী আর আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী। ফলে তা সহজে বুঝে বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে গেছে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য বেশি বেশি দারসে কুরআন চালু হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে নিজের ভাষায় কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য দারস দানের যে সব পদ্ধতি রয়েছে তা অবলম্বন করে দারস প্রদান করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিম্নে দারসে কুরআন বক্তৃতা দানের পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

দারসের পূর্বের কাজ ঃ

১। পরিবেশ এবং মজলিশে কোন ধরনের শ্রোতা উপস্থিত হবেন সেই দিকে খেয়াল রেখে দারসের অংশ বাছাই করে নেবেন।

২। দারস দেবার জন্য কতটুকু সময় পাবেন সেই প্রাপ্ত সময়ের অনুপাতে দারসের অংশ বাছাই করবেন।

৩। দারসের জন্য বাছাইকৃত অংশটুকু বিশুদ্ধ তিলাওয়াতসহ ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে নোট করে নেবেন।

৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর লেবাসে নির্ধারিত সময়ের আগেই মজলিশে বা বৈঠকে উপস্থিত হবেন।

দারস-এর বক্তৃতা পদ্ধতিঃ

১। **বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ঃ** প্রথমেই আপনি যে অংশের দারস পেশ করবেন সে অংশটুকু তা'উজ (আউ'যুবিল্লাহ) এবং তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ্)সহ ধীর স্থীরভাবে সুন্দর লেহানে তিলাওয়াত করে নিবেন। সাবধান থাকবেন যাতে করে কোন ভাবেই তিলাওয়াত 'লেহানে জ্বলী' অর্থাৎ গুনাহর পর্যায়ে পড়ে

www.pathagar.com

না যায়। দারসের জন্য বিশুদ্ধ তিলাওয়াত না হলে যেমন গুনাহগার হবেন তেমনি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যারা সহীহ তিলাওয়াত জানেন আপনার ওপর প্রথমেই তাদের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে এবং দারসের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হবে।

২। **সরল তরজমা বা অনুবাদঃ** দারসের জন্য আপনি যে অংশটুকু তিলাওয়াত করলেন, আয়াত বা বাক্য ভিত্তিক তার তরজমা বা অনুবাদ পেশ করবেন। তবে সময় বেশি পাওয়া গেলে অনুবাদ করবেন নচেত ব্যাখ্যার সময় একই সাথে অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করবেন।

৩। **সম্বোধনঃ** তিলাওয়াত এবং তরজমার পরে উপস্থিত শ্রোতাদের (পুরুষ-মহিলা থাকলে উভয়কেই) অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবে সম্বোধন করবেন। আপনার সম্বোধনে যেন আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে সে দিকে খেয়াল রাখবেন। আর সম্বোধনের সময় কোন্ সূরার কতো থেকে কতো আয়াত তিলাওয়াত করলেন তাও উল্লেখ করবেন এবং সফলভাবে দারস প্রদান করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করবেন। অতঃপর নিচের পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে অবলম্বন করে দারস পেশ করবেন।

৪। **সূরার নামকরণঃ** তিলাওয়াতকৃত অংশ যে সূরার সেই সূরার সংক্ষিপ্তভাবে নামকরণ সম্পর্কে তথ্য পেশ করবেন। কেন এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয়েছে এবং সূরার বিষয়ের সাথে নামের কি সম্পর্ক আছে তা সংক্ষিপ্তভাবে অল্প কথায় তুলে ধরবেন। তবে সময় যদি কম হয় তাহলে নাম করণ সংক্রান্ত বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন নেই।

৫। **নাযিল হবার সময়কাল ঃ** তিলাওয়াতকৃত সূরা বা আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওয়াতের কোন্ সময় বা অধ্যায়ে নাযিল হয় এবং তখন পরিবেশ কেমন ছিলো তা সংক্ষেপে তুলে ধরবেন। তবে এ বিষয়টিও সময়ের ওপর নির্ভর করবে। সময় কম পেলে নাযিল হবার সময়কালের ওপর বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন নেই।

৬। **বিষয় বস্তুঃ** বিষয়বস্তু দু'ধরনের হতে পারেঃ- ক) সূরার বিষয়বস্তু, খ) তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু। কম সময় পাওয়া গেলে পৃথকভাবে বিষয়বস্তু উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

৭। পটভূমি বা শানে নুযূল ঃ পটভূমি দুটি বিষয়ের হতে পারে ক) সংশ্লিষ্ট সূরার পটভূমি, খ) সংশ্লিষ্ট আয়াতের পটভূমি।

পটভূমিতে নীচের বিষয়গুলো শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেনঃ

● আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

● স্থান কাল পাত্র উল্লেখ।

● মাক্কী এবং মাদানী সূরার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।

● ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার যোগসূত্র থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ।

শানে নুযূলঃ ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা না থাকলে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের কারণ) উল্লেখ করবেন।

সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পটভূমি তুলে ধরবেন। সময় কম পাওয়া গেলে পটভূমি তুলে ধরার প্রয়োজন নেই, সংক্ষিপ্তভাবে শানে নুযূল পেশ করবেন।

৮। ব্যাখ্যা ঃ ব্যাখ্যার সময় নীচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেনঃ

● যে অর্থে আয়াত নাযিল হয়েছে সেই মর্মার্থ তুলে ধরবেন।

● বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা করবেন।

● বিশেষ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা পেশ করবেন।

● সূরার এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে ব্যাখ্যা পেশ করবেন।

● ব্যাখ্যার সময় সাধ্যানুযায়ী সম্পর্কশীল অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসের রিফারেন্স (উদ্ধৃতি) প্রদান করবেন।

● ব্যাখ্যার সময় বর্তমান অবস্থার সাথে কি সম্পর্ক আছে তা তুলে ধরবেন।

● ব্যাখ্যার সময় কোনো প্রকার গোজামিলের আশ্রয় নিবেন না। সতর্ক থাকতে হবে কোনভাবেই যেন অপ্রাসঙ্গিক এবং নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা না হয়। হাদীসে উল্লেখ আছে 'যে ব্যক্তি কুরআন (বা কুরআনের কোনো আয়াত) সম্পর্কে নিজের খেয়াল খুশি মতো বা অজ্ঞতা নিয়ে কথা বললো, সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা খুজে নেয়।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জরীর, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।)

৯। শিক্ষা ঃ সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কি

www.pathagar.com

কি শিক্ষা দিতে চান, তা সংক্ষিপ্তভাবে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরবেন। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেনঃ

- সাধারণদের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে।
- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে।
- বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কি করণীয় আছে।

১০। আহ্বান ঃ দারসে কুরআন শেষ করার পূর্ব মুহূর্তে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেবেন। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে নাযাতের জন্য বাস্তব জীবনে (নিজেকে সহ) আমল করার তৌফিক কামনা করে পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার আহ্বান জানিয়ে সালাম দিয়ে শেষ করবেন।

প্রশ্নউত্তর

দারসে কুরআন শেষ করে পরিবেশ যদি অনুকূলে থাকে এবং সময় পাওয়া যায় তাহলে যে অংশের দারস পেশ করলেন তার ওপর প্রশ্ন আহ্বান করবেন। প্রশ্নের উত্তর দানের সময় যেটি আপনার ভালভাবে জানা আছে তা স্পষ্টভাবে উত্তর দিবেন। কোনোভাবেই গোজা মিলের আশ্রয় নেবেন না। উত্তর জানা না থাকলে সময় নেবেন এবং পরবর্তীতে জানানো হবে বলে প্রশ্নকারীকে আশ্বস্ত করবেন। প্রশ্নকারীকে কোনোভাবেই কটাক্ষ করবেন না। সময় নিয়ে উত্তর দেয়াটা দুর্বলতার লক্ষণ নয় বরং পান্ডিত্তের লক্ষণ।

www.pathagar.com

দারসের সময় বন্টন

দারস দানকারীকে অবশ্যই নির্ধারিত সময়কে সামনে রেখেই দারসের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হবে। দারস দানকারীর সুবিধার জন্য নীচে সময় বন্টনের ৪ টি নমুনা উল্লেখ করা হলো ঃ

এক

১ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত	৫/৬ মিনিট
সরল তরজমা বা অনুবাদ	৫/৬ ”
সম্বোধন	২/২ ”
সূরার নামকরণ	২/৩ ”
নাযিল হবার সময়কাল	২/৩ ”
ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুযূলসহ)	৭/১০ ”
বিষয়বস্তু	২/৩ ”
ব্যাখ্যা	৩০/৩৫ ”
শিক্ষা	৪/৫ ”
আহ্বান	১/২ ”

দুই

৪৫ মিনিট থেকে ৫৫ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত	৫/৬ মিনিট
সরল তরজমা বা অনুবাদ	৫/৬ ”
সম্বোধন	২/২ ”
সূরার নামকরণ	১/২ ”
নাযিল হবার সময়কাল	১/২ ”
ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুযূলসহ)	৫/৭ ”
বিষয়বস্তু	১/২ ”
ব্যাখ্যা	২০/৩০ ”
শিক্ষা	২/৪ ”
আহ্বান	২/২ ”

www.pathagar.com

তিন

৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত	২/৩ মিনিট
সরল তরজমা বা অনুবাদ	২/২ ”
সম্বোধন	১/১ ”
সংক্ষিপ্ত পটভূমি (শানে নুযূলসহ)	৪/৫ ”
ব্যাখ্যা	২২/৩৫ ”
শিক্ষা	২/৩ ”
আহ্বান	২/২ ”

চার

২০ মিনিট থেকে ২৫ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত –	২/৩ মিনিট
সম্বোধন –	১/১ ”
শানে নুযূল –	২/৩ ”
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –	১২/১৪ ”
শিক্ষা –	২/৩ ”
আহ্বান –	১/১ ”

www.pathagar.com

দারস দানকারীর করণীয়

দারসে কুরআন পেশ করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলা ভাষায় সহজ করে কুরআনকে বুঝানো এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা। এ জন্য দারস দানকারীর সেই উদ্দেশ্য সফলের জন্য কতকগুলো করণীয় রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। আধুনিক শিক্ষিতদের জন্য আরবী শব্দের অর্থ জানা এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বাংলায় আরবী ব্যাকরণ এবং 'আল কুরআনের অভিধান" বইটি পড়া।

২। বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য বাংলায় যে সব তাজ্‌বিদের কিতাবগুলো আছে তা পড়া এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদের ঈমাম, ক্বারী বা হাফেজ সাহেবদের কাছ থেকে সহীহ্ তিলাওয়াত শিক্ষা করা এবং মাঝে মাঝে পড়িয়ে শুনানো। এ কাজটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ফরজ।

৩। যে অংশটুকু দারস দিবেন তা ভাল ভাবে কয়েকবার তিলাওয়াত করে নিতে হবে। যাতে দারস প্রদানের সময় বেধে বেধে না যায় এবং কষ্ট দায়ক না হয়।

৪। দারসে কুরআনের পূর্বে দেহের পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হলে গোছল করে নিতে হবে। নতুবা ওযু করে নিতে হবে। কোন ভাবেই বিনা ওযুতে দারসে কুরআন পেশ করা যাবে না।

৫। দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে। যারা পান খেতে অভ্যস্ত তারা যেনো মেসওয়াক বা ব্রাসের দ্বারা ভালভাবে দাঁত এবং মুখ পরিষ্কার করে নেন। যারা পান খেতে বেশি অভ্যস্ত তারা যেন কোনো অবস্থাতেই পান চিবাতে চিবাতে দারস প্রদান না করেন। কেন না এতে দারসের আদব নষ্ট হয় এবং উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৬। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। তাতে পোষাক কম দামের হোক অথবা বেশি দামের হোক।

৭। প্যান্ট শার্ট পরে এবং খালি মাথায় দারস না দেওয়া সমিচীন। কেননা এতে দারসের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

www.pathagar.com

৮। দাড়ি এবং মাথার চুল ভাল ভাবে চিরুণী করে নিতে হবে। চুল এবং দাড়ি এলোমেলোভাবে রেখে দারস প্রদান করা ঠিক নয়। কেননা এতে শ্রোতাদের মধ্যে দারসদানকারীর প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।

৯। দারস দানকারীর আতর ব্যবহার করা উচিৎ। এতে দারসদানকারীর প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং নিজের মন উৎফুল্ল ও উদার থাকে।

১০। যথাসময়ে দারসের মজলিশে বা বৈঠকে উপস্থিত হতে হবে। কোনোভাবেই নির্দ্ধারিত সময়ের পরে হাজির হওয়া যাবে না। কেননা এতে উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে দারস দানকারীর সময়ের ব্যাপারে দায়িত্বহীণতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

১১। দারসের সময় উপস্থিত শ্রোতাদের যাতে সকলকেই দেখা যায় এবং শ্রোতারাও দেখতে পান এ জন্য মজলিশের উপস্থিতি অনুযায়ী একটু উঁচু স্থানে বসার চেষ্টা করা।

১২। দারসের সময় কুরআন শরীফ সামনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, না হলে দারসে কুরআনের বই সামনে রেখে দারস প্রদান করতে হবে।

১৩। দারসের জন্য পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় বিষয়ের নোট করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১৪। দারসের সময় শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দারস প্রদান করতে হবে। স্রোতারা যাতে বুঝতে না পারেন যে, দারস দাতা দেখে দেখে পড়ছেন।

১৫। কথার জড়তা না রেখে স্পষ্ট ভাষায় এবং উপস্থিত স্রোতাদের মান এবং ভাষার সাথে মিল রেখেই ভাষা প্রয়োগ করতে হবে।

১৬। দারসের সময় একই কথা বার বার উল্লেখ করা সঠিক নয়।

১৭। দারস দানের সময় (যদি সাধারণ শ্রোতা হয়) তা হলে কোনো ভাবেই কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি কটাক্ষ বা আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের লোকদের দারসের উপরই ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

১৮। দারস দান করার সময় নিজেকে বা পরিবারের সদস্যদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা ঠিক নয়। কেননা এতে রিয়া সৃষ্টি হয় এবং স্রোতাদের ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৯। দারসের কোনো বিষয়ের প্রতি আহ্বানের সময় 'আপনাদের' না বলে 'আমাদের" শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। কেননা প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে জড়িয়েই কথা বলা সমিচীন। তাছাড়া 'আমি' 'আমি' না বলে 'আমরা' বলা উচিত। কেননা সম্মানি ব্যক্তিরা এমনকি আল্লাহ্ তায়ালাও আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমি এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছেন।

২০। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দারস শেষ করা উচিত। কেননা কথায় আছে "শেষ ভাল যার সব ভাল তার।"

২১। সর্বপরি দারসদানকারীকে বাস্তব জীবনে তাক্ওয়াবান হতে হবে এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। নচেৎ আল কুরআনের দারসের যে উদ্দেশ্য তা পুরোপুরি বিফল হয়ে যাবে।

২২। দারস দানকারীকে অবশ্যই বিশুদ্ধ নিয়্যাত নিয়ে দারস পেশ করতে হবে। কোনোভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান, সুখ্যাতি বা দুনিয়ার কোনো খেয়াল মনের মধ্যে রাখা যাবে না। বক্তৃতার মধ্যে খুলুসিয়াতের পরিচয় তুলে ধরতে হবে।

২৩। দারসদানকারীর জন্য সর্বশেষ করণীয় হলো নিজের এবং অন্যদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোআ কামনা করা।

দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা

শানে নুযূলঃ شَأْنٌ (শান) আরবী শব্দটির অর্থ-উপলক্ষ্য, কারণ, হেতু, অবস্থা ইত্যাদি। আর نُزُوْل (নুযূল) শব্দটির অর্থ অবতীর্ণ। অতএব 'শানেনুযূল'-এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় অবতরণের হেতু, উপলক্ষ্য বা কারণ।

সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মহানবী (সাঃ)-এর ওপর একযোগে অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনা ও প্রয়োজনে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ওহীর মাধ্যমে খন্ড খণ্ড ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

এরূপভাবে সেই সব উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হিসেবে পবিত্র কুরআনের সূরা বা সূরার অংশ মহানবী (সাঃ)-এর ওপর জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আর একেই শানে নুযূল বা অবতরণের হেতু বা উপলক্ষ্য বা কারণ বলা হয়।

www.pathagar.com

মাক্কী ও মাদানী সূরার সংজ্ঞা

মাক্কী সূরাঃ মাক্কী মাদানী সূরার সংজ্ঞা হিসেবে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য মত হলোঃ মাক্কী সূরা বা আয়াত বলতে সেই সব সূরা বা আয়াতকে বুঝায় যে সব সূরা বা আয়াত মহানবীর মক্কায় অবস্থান কালে অর্থাৎ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে মক্কায় অথবা অন্য কোথাও অবতীর্ণ হয়েছে।

মাদানী সূরা ঃ যে সব সূরা বা আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরাতের পরে তাঁর মাদানী জীবনে মদীনায় অথবা অন্য কোথায়ও অবতীর্ণ হয়েছে, সে সব সূরা বা আয়াতকে মাদানী সূরা বা আয়াত বলে।

মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যাঃ

কুরআন মজীদে ১১৪টি সূরা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেছেন।

ইমাম সূয়ুতী তাঁর রচিত কিতাব 'আল ইতকানে' অনেকগুলো বর্ণনা পেশ করেছেন। কোনো বর্ণনায় ২৭টি কোনো বর্ণনায় ২৬টি কোনো বর্ণনায় ২৮টি এবং কোনো বর্ণনায় ২৯টি মাদানী সূরার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাদশাহ ফাহাদ কুরআন ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কুরআন শরীফে মাদানী সূরা ২৮ এবং মাক্কী সূরা ৮৬টি উল্লেখ করা হয়েছে।

কয়েকটি সূরা এমন আছে, যেগুলো মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

আবার বেশ কয়েকটি সূরা এমনও আছে যেগুলোতে মাক্কী ও মাদানী আয়াতের সংমিশ্রণ আছে।

মাক্কী ও মাদানী সূরা চেনার উপায়ঃ

কাযী আবু বকর তাঁর 'ইন্তেসার' কিতাবে লিখেছেনঃ মাক্কী এবং মাদানী সূরার পরিচয়ের উৎস হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)। মহানবী (সাঃ) থেকে এ ব্যাপারে কোনো কথা পাওয়া যায় না। কারণ, তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ পাননি। আর মাক্কী এবং মাদানী সূরা জানা আল্লাহ তাআলা উম্মতের জন্য ফরয করে দেননি। (জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ আল ইত্কান ফী উলুমিল কুরআন)।

www.pathagar.com

মাক্কী ও মাদানী সূরা চেনার জন্য নিম্নে কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো ঃ

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্যঃ

১। যে সব সূরায় كَلَّا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা মাক্কী।

২। যে সব সূরায় আদম (আঃ) এবং ইবলিসের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা মাক্কী। তবে সূরা বাকারা এ মূলনীতির বাইরে।

৩। মাক্কী সূরাগুলো সাধারণতঃ আকারে ছোট ও সংক্ষিপ্ত।

৪। যেসব সূরায় يَاأَيُّهَا النَّاسُ অর্থাৎ 'ওহে মানব জাতি'! বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কী।

৫। মাক্কী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, আখিরাত ও হাশরের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যঃ

১। যে সব সূরায় জিহাদের নির্দেশ রয়েছে তা মাদানী।

২। যে সব সূরায় মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা মাদানী।

৩। মাদানী সূরাগুলো সাধারণতঃ আকারে বড় ও বিস্তারিত।

৪। যে সব সূরায় يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ 'ওহে ঈমানদারগণ'! বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানী।

৫। মাদানী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে শরীয়তের হুকুম-আহকাম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, হালাল, হারাম, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিরাছ, লেনদেন, পররাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা, জিহাদ, বন্দী নীতি, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

www.pathagar.com

এক নজরে আল কুরআনের পরিচয়

● আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়-মানুষ।

● আল-কুরআনের উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়েত।

● আল-কুরআন হিজরী পূর্ব ১৩ সনে (৬১০ খৃষ্টাব্দ) রমযান মাসে লাইলাতুল কদরে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

● হিজরী ১১ সনে (৬৩২ খৃঃ) সফর মাসে অবতীর্ণ শেষ হয়।

● সর্ব প্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো হচ্ছেঃ সূরা আ'লাকের প্রথম ৫ আয়াত।

● সর্ব প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছেঃ সূরা আল ফাতিহা।

● সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছেঃ সূরা মায়েদার ৪ নং আয়াত।

● সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছেঃ সূরা আল-নাছর।

● হিজরী ১২ সনে (৬৩৩ খৃঃ) আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ লিখিতরূপ দেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)।

● হিজরী ৭৫ সনে (৬৯৪ খৃঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল-কুরআনের হরকত (যের, যবর, পেশ) দেন।

● আল-কুরআনের পারা - ৩০টি।

● আল-কুরআনের সূরা - ১১৪টি।

ক) মক্কী সূরা মোট ৮৬টি অথবা ৮৯টি।

খ) মাদানী সূরা মোট - ৩১টি অথবা ২৫টি।

● মনজিল - ৭টি।

● রুকু মোট - ৫৬১টি।

● আয়াত মোট - ৬৬৬৬টি অথবা ৬২৭৩টি।

● শব্দ মোট- ৮৬৪৩০টি অথবা ৭৭৪৩৯টি অথবা ৭৬৪৪০টি।

● অক্ষর মোট - ৩,২৩,৬৭১টি অথবা ৩,১২,৬৯০টি।

● ওয়াক্‌ফ (বিরতি চিহ্ন) মোট - ৫০৫৮টি।

● আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দ আছে মোট - ২৫৮৪ জায়গায়।

● মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) শব্দ আছে মোট-৪ জায়গায়।

● লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) আছে মোট-২ জায়গায়।

● সিজদাহ্ - ১৪টি। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে ১৫টি।

● আল কুরআনে মোট - ৫৩২৪৩টি যবর, ৩৯৫৮২টি যের, ৮৮০৪টি পেশ, ১৭৭১টি মাদ্, ১২৫৩টি তাশদীদ এবং ১০৫৬৮১ টি নুক্তা আছে।

www.pathagar.com

মুত্তাকীনদের গুণাবলী

সূরা বাকারা ১-৫ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ـ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝
اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا
اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰۤئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

সরল অনুবাদঃ এরশাদ হচ্ছে (১) আলিফ লা-ম মী-ম। (২) এটি সেই কিতাব (আল কুরআন) যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা সেই সব মুত্তাকীন বা পরহেযগারদের জন্য পদ প্রদর্শনকারী জীবন ব্যবস্থা, (৩) যারা গায়েবে অর্থাৎ অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং যারা (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (৪) এবং যারা যে কিতাব (আর কুরআন) তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে ও তোমার আগে (অন্যান্য নবীদের ওপর) যে সব কিতাব নাযিল করা হয়েছে সে সবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) বস্তুতঃ এ ধরনের গুণের লোকেরাই তাদের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার ওপর রয়েছে এবং এরাই সার্থক সফলকামী।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ

ذٰلِكَ - ওটি, এটি। اَلْكِتٰبُ- গ্রন্থ। لَا - না। رَيْبَ - সন্দেহ। فِىْ - মধ্যে। ه - এতে, তাতে। هُدًى - পথ প্রদর্শক। لِ - জন্য। اَلْمُتَّقِيْنَ - আল্লাহ ভীরু বা পরহেযগার। اَلَّذِيْنَ - যারা। يُؤْمِنُوْنَ - তারা বিশ্বাস করে। بِ - প্রতি বা সাথে। اَلْغَيْبِ - অদৃশ্য। وَ - এবং يُقِيْمُوْنَ - তারা প্রতিষ্ঠিত করে। الصَّلٰوةَ - নামায। مِمَّا - যা হতে। رَزَقْنَا - আমরা রিযিক দিয়েছি। هُمْ - তাদেরকে। يُنْفِقُوْنَ - তারা খরচ বা ব্যয় করে। بِ - প্রতি। مَا - যা। اُنْزِلَ - অবতীর্ণ করা হয়েছে। اِلٰى- প্রতি বা দিকে। كَ - তোমার। مِنْ - হতে। قَبْلِ - পূর্বে। الْاٰخِرَةِ - পরকাল। هُمْ - তারা। يُوْقِنُوْنَ - তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। اُوْلٰئِكَ - তারা। عَلٰى - ওপর। رَبِّ- প্রতিপালক। اَلْمُفْلِحُوْنَ - সফলকামী বা কৃতকার্য।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার (শুধু পুরুষ হলে ভায়েরা। শুধু মহিলা হলে বোনেরা। আর যদি পুরুষ মহিলা উভয়ই থাকে তাহলে ভাই ও বোনেরা)। আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহে অবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সব চেয়ে বড় সূরা সুরাতুল বাকারার ১ থেকে ৫ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে সহীহ সালামতে দারসে কুরআন পেশ করার তৌফিক দান করেন। "অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ এ সূরার নাম "সূরাতুল বাকারা"। 'বাকারাহ্' শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। এ সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ নং আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতি গরু কোরবানীর হুকুম দিতে গিয়ে 'বাকারা' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। বিধায় এই সূরার নাম সূরাতুল বাকারা রাখা হয়েছে। সূরা বাকারা নাম করণের ফলে এটা মনে করা যাবে না যে, এতে শুধু গরু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই এতো

www.pathagar.com

বেশি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনো সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এজন্য নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশ মতো শিরোনামের পরিবর্তে সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে সূরার পরিচিতি হিসেবে নামকরণ করেছেন। সূতরাং 'বাকারাহ' নামটি এই সূরার পরিচিতি হিসেবে নেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময় কাল ঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এর কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে যেমন সূদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়। আবার এই সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিলো, কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে ওহীর মাধ্যমে।

এই সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরাতের পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে বলে এই সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এটা কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের পরিচয়, আদম এবং হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাহ্দের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

পটভূমি ঃ মাক্কী সূরাগুলোতে আল্লাহ্ পাক সাধারণতঃ মক্কার কাফের ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেই বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নাযিল করেন। তার কারণ মক্কাতে এ দু'টি দলই ছিলো। মুসলমানেরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল এবং কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম হিসেবে মানতো এবং কাফেরেরা রাসূলের বিরোধীতা করতো ও কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করতো না। এ জন্য এই দু'দলের উপলক্ষ্যেই কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। কিন্তু মদীনায় হিজরাতের পর আরো দু'টি দল 'ইহুদী' ও 'মুনাফিক' এদের মোকাবিলা করতে হলো। ইহুদীরা আহলে কিতাব হবার কারণে তারা নবী, রাসূল, বেহেশত, দোযখ, কিয়ামত, আখেরাত ও আসমানী কিতাব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতো এবং সেগুলো বিশ্বাস করতো। অতীতের আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলে রাসূলের পরিচয় ও তাঁর ওপর নাযিল করা কুরআন আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কালাম হবার সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা খালি খালি হিংসার বশবর্তী হয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে জানা-শুনার পরও রাসূলের বিরোধিতা করতো। আর মুনাফেকরা মুসলিম সমাজের সুযোগ সুবিধা পাবার লোভে মুখে মুখে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করলেও ভিতরে ভিতরে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় শত্রুতা করতো। এমন কি তারা কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার দলকে ধ্বংস করা যায় তার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতো। সূরা বাকারা মাদানী হবার কারণে এতে ওপরের চার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে মুযেহুল কুরআন নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মালেক ইবনে সায়ফ নামক জনৈক ইহুদী মুসলমানদের পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ বলে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যে কিতাবের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এই কুরআন সেই কিতাব নয়। আল্লাহ্ পাক তার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবার জন্য সূরা বাকারা বিশেষ করে সূরা বাকারার প্রাথমিক এই ছয়টি আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআন এবং সূরা বাকারা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবার পর এখন আমি আপনাদের সামনে দারসে কুরআনের জন্য তিলাওয়াতকৃত অংশের বিভিন্ন আয়াত এবং প্রয়োজনীয় শব্দগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি ঃ

الٓمّٓ ঃ 'আলিফ, লা-ম, মী-ম,' এই তিনটি অক্ষরকে 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের সর্বমোট

www.pathagar.com

২৯টি সূরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনে দুধরনের আয়াত বর্ণিত হয়েছে একটি 'মুহকামাত' স্পষ্ট বা প্রকাশ্য অর্থ বিশিষ্ট এবং অপরটি 'মুতাসাবিহাত' অস্পষ্ট বা অপ্রকাশ্য অর্থ বিশিষ্ট। এই অক্ষরগুলো হলো 'মুতাসাবিহাত'। এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন। তবে কোন কোন তাফসীরকারক ا দিয়ে اَنَا (আমি) ل দিয়ে اَللّٰه এবং م - দিয়ে اَعْلَمُ (বেশী জানি) অর্থাৎ اَنَا اَللّٰهُ اَعْلَمُ 'আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি'। আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে ا -দিয়ে আল্লাহ্ ل - দিয়ে জিবরাঈল এবং م - দিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক মনীষী এই অক্ষরগুলোর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তবে এসব অর্থের সবগুলোই অনুমান ভিত্তিক। ইসলামী শরীয়তে এগুলোর একটিও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়নি। কেননা এই অক্ষরগুলোর অর্থ হুযুর (সাঃ) উল্লেখ করে যাননি। সুতরাং এ অক্ষরগুলোর অর্থ জানার জন্য বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। এ সম্পর্কে সূরা ইমরানের ৭নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ
الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ
تَاْوِيْلِهٖ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي
الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ـ الخ

"(হে নবী) তিনিই আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত আছে 'মুহ্কামাত (স্পষ্ট) সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাসাবিহাত (অস্পষ্ট)। ফলে যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে, তারাই মুতাসাবিহাত বা অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে ফিৎনা সৃষ্টি এবং অপব্যাখ্যার জন্য। অথচ সেগুলোর অর্থ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। যারা জ্ঞানী তারা বলে ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের রব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।"

কিন্তু আফসোস আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা নিজেদেরকে সুফীবাদী বলে দাবী করে। তারা এ ধরনের আয়াতের অর্থ এবং তাৎপর্য তালাশে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে, কুরআন ৪০ পারা। ৩০ পারা প্রকাশিত আর ১০ পারা গোপন রয়েছে। এরা বিভ্রান্ত, এদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - "এটি এমন এক কিতাব যার মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই।"

ذٰلِكَ সাধারণতঃ যালিকা শব্দটি কোনো দূরবর্তী জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেহেতু কুরআন নিকটে দূরে নয় সেই জন্য তাফসীরকারগণ যালিকা শব্দের আগে هٰذَا (এই) নিকটবর্তী ইঙ্গিত বাচক একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ "هٰذَا ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ" "এটা সেই কিতাব যেই কিতাব সম্পর্কে পূর্বের আসমানী কিতাব সমূহে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।"

الْكِتٰبُ এখানে কিতাব দিয়ে আল কুরআন বুঝানো হয়েছে।

رَيْبَ এর অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে "এ এমন একটি কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন সুযোগ নেই।"

আল্লাহ্ তাআলা তার নিজের রচিত কিতাব আল-কুরআনের ভূমিকাতেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার এই কিতাবের ব্যাপারে কোনো সংশয়-সন্দেহের সুযোগ নেই। শুরুতে এ কথা ঘোষণার দ্বারা মানুষের মনে যাতে করে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হতে না পারে তার সুযোগ বন্ধ করে দেন।

বিশেষ করে ইহুদীদের পক্ষ থেকে কুরআনকে আসমানী কিতাবের মর্যাদা না দেবার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো তা প্রতিহত করার জন্য প্রথমেই তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন এবং তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে অত্র সূরার ২৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেন "আমার বান্দা মুহাম্মদের (সাঃ) প্রতি

www.pathagar.com

যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মতো একট একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যে সব সাহায্যকারী আছে তাদেরকেও সাথে নাও, যদি তোমারই সত্যবাদী হয়ে থাকো।" কিন্তু তারা একটি সূরা তো দূরের কথা একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

অপরদিকে দেখা যায় দুনিয়াতে মানুষ যে সব বই রচনা করে, তার ভূমিকাতেই তারা নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা এবং অপরের পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা আল্লাহ তাআলা সকল ভূলের ঊর্ধ্বে এবং তিনি সব কিছুর স্রষ্ঠা। কিন্তু মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়। আল্লাহর জ্ঞান অসীম আর মানুষের জ্ঞান সসীম সীমিত। বিধায় মানুষের তৈরি করা গ্রন্থে ভুল থাকাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর কিতাবে কোন ভুল নেই এবং ভুলও হতে পারে না। কুরআনে যে কোনো ভুল নেই এবং সন্দেহের সুযোগ নেই, বর্তমান আধুনিক যুগেও তা প্রমাণিত হয়েছে। পাশ্চাত্য পন্ডিত বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস বুকাইলী কুরআনের ভুল-ত্রুটি ধরার জন্য গবেষণা করতে গিয়ে, কুরআনের একটি যের যবরের ভুল পর্যন্ত ধরতে পারেননি। বরং তিনিই যে ভুলের মধ্যে ডুবে আছেন, তা ধরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কুরআনকে নির্ভুল এবং সংশয়মুক্ত আসমানী কিতাব হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান তুলনামূলক আলোচনা করে তা বিশ্বের দরবারে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

هُدًى - শব্দের অর্থ পথো নির্দেশিকা অর্থাৎ যে পথ দেখায়, সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দাতা, যা অনুসরণের যোগ্য জীবন যাপনের বিধান। কেননা আল-কুরআন হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রীক জীবনের সব নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান‘ কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আর এর বাস্তবে রূপদাতা হলেন স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ)।

مُتَّقِيْنَ শব্দের অর্থ হলো– খোদাভীরু, পরহেযগার, হুশিয়ার, সাবধানী ও আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচার জন্য সদা সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পবিত্র আল-কুরআন কেবলমাত্র সে ধরনের লোকদের জন্যই পথ নির্দেশিকা বা জীবন বিধান, যারা মুত্তাকী।

www.pathagar.com

কুরআন তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য হেদায়েদ বা পথনির্দেশিকা। (এক) সমস্ত মানুষের জন্য (দুই) মুসলমানদের জন্য। (তিন) মুত্তাকীনদের জন্য। এখানে আয়াতে কুরআনকে খাস করে মুত্তাকীনদের হেদায়েত লাভ করার কিতাব বলা হয়েছে।

মুত্তাকীনদের গুণাবলী - আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীনদের জন্য কুরআনকে পথ নির্দেশিকা বা জীবন বিধান হিসেবে উল্লেখ করে পরবর্তী দুটি আয়াতে মুত্তাকীনদের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। মদীনায় যারা ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের জন্যই শুধু নয়, বরং সর্বকালের সকল নিষ্ঠাবান মুমিনদের গুণাবলীই হয়ে থাকে এরকম ঃ

প্রথম গুণ ঃ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ তারা (মুত্তাকীনরা) অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। মুত্তাকীনদের প্রথম গুণই হলো তারা অদেখা জিনিষ বিশ্বাস করে।

ঈমান কি? ঈমান শব্দের অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে বিশ্বাসের সাথে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। এ জন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দেখা কোনো জিনিসে কারো কথায় বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোনো প্রভাব বা দখল নেই। অপর দিকে রাসূল (সাঃ)-এর কোনো সংবাদ কেবলমাত্র রাসূলের ওপর বিশ্বাসী হয়ে মেনে নেয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে।

غَيْب গায়েব অর্থ হচ্ছে এমন সব জিনিস যা বাহ্যিক ভাবে মানুষের জ্ঞানের বাইরে এবং যা মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না, চোখ দিয়ে দেখতে পায় না, কান দিয়ে শুনতে পায় না, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দিয়ে ছুইতে পারে না, ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেও পারে না।

কোরআনে غَيْب শব্দ দিয়ে সে সব বিষয়কেই বুঝানো হয় যেগুলোর সংবাদ রাসূল (সাঃ) দিয়েছেন এবং মানুষ সে সব বিষয়ে নিজের বুদ্ধিতে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় গুণ ঃ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে। কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করার জন্য মুত্তাকীনদের দ্বিতীয় গুণ হলো- তারা শুধু মৌখিক ভাবে স্বীকার করেই দায়িত্ব পালন শেষ করে না। বরং তারা বাস্তব জীবনে নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করে। ঈমান আনার দাবীর সাথে সাথে যখন 'মুয়াজ্জিন' সুমধুর সুরে আজানের ধ্বনি দিয়ে ডাকে 'হাইয়্যালাস্‌সালাহ" তোমরা নামাযের জন্য আসো, তখন যদি একজন ঈমানের দাবীদার আযানের ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বাস্তব জীবনে ঈমানের দাবী পূরণ করতে প্রস্তুত নয়। অতএব নামায ত্যাগ মানেই হলো আনুগত্য ত্যাগ করা। আনুগত্য ত্যাগ করাই হলো মুসলমানিত্য ত্যাগ করা। কেননা হাদীসে এসেছে "بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ" কুফর এবং আবেদের (মুসলমানের) মধ্যে পার্থক্য হলো নামায।' আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আরো বলেন ঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ -
"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামায ত্যাগ করলো সে কুফরী করলো।"

আমাদের আরো জানা থাকা দরকার যে, নামায কায়েম করা মানে নামায পড়া নয়। বরং এর অর্থ ব্যাপক। কুরআনে যেখানেই নামাযের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই নামায ব্যক্তিগতভাবে আদায় করলে কায়েম অর্থ বুঝাবে না। বরং সবাই মিলে জামায়াতের সাথে আদায় করলে তবেই নামায কায়েম করা বুঝাবে।

নামায কায়েম করার অর্থ সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং মুফাসসিরগণ যে সব অর্থ নিয়েছেন তা হলো এই -

কুরআনের অভিমত ঃ রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায কায়েম করার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তারা যখন দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব পায় তখন তারা প্রথমেই নামায কাযেম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে বাধা সৃষ্টি করে।" (সূরা হজ্ব ঃ ৪১)

হাদীসের অভিমতঃ যখন (মুসলমান) কোনো ছেলে অথবা মেয়ের দশ বছর বয়স হয়ে যায় তখন তার ওপর নামায ফরজ হয়ে যায় এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "তোমাদের ছেলে মেয়েরা যখন সাত বছর বয়সে পড়ে তখন তাদেরকে নামাযের জন্য হুকুম দাও। আর যখন বয়স দশ বছর

www.pathagar.com

হয়ে যাবে তখন তাদেরকে (নামায না পড়লে) মারো এবং প্রয়োজনে আলাদা করে দাও।" (আবু দাউদ)

মুফাস্‌সীরদের অভিমতঃ নামায কায়েম অর্থে মুফাস্‌সীরগণ বলেন ঃ নামাযের যে হক অর্থাৎ, পাক পবিত্রতা অর্জন, নামাযের বাইরের এবং ভিতরের যে সব শর্ত রয়েছে তা যথাযথভাবে আদায়, সময় মতো জামায়াতের সাথে নামায আদায়। মোট কথা নামাযের যে হক রয়েছে তা পূর্ণভাবে আদায় করাই হলো নামায কায়েম করা।

জামায়তের সাথে নামায আদায়– নামায কায়েমের একটি বড় শর্ত। এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) অনেক কথায় বলেছেন, তার মধ্যে একটি হাদীস হলোঃ "একবার রাসূল (সাঃ) বললেনঃ যারা জামায়াতে নামায পড়তে আসে না তাদের বাড়িতে যদি শিশু এবং নারীরা না থাকতো, তা হলে আমি ইশার নামায শুরু করে দিয়ে যুবদেরকে তাদের ঘরে আগুন লাগাতে পাঠিয়ে দিতাম।" (আহমদ)

সবশেষে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি বাড়িতে নামায কায়েম তখনই হবে যখন দশ বছর থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ বেহুশ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির নারী-পুরুষ সবাই নামায পড়বে। অনুরূপভাবে যখন একটি পাড়া বা গ্রামে সবাই মিলে নামায পড়বে তখন বলা যাবে সেই পাড়া বা গ্রামে নামায কায়েম হয়েছে। এভাবে যখন গোটা দেশের মুসলমান পুরুষ এবং নারী সবাই মিলে নামায পড়বে, তখনই বলা যাবে সেই দেশে নামায প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুতরাং এতে বুঝা যে আমরা এখনো নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। আমরা নামায পড়ছি মাত্র।

সুতরাং মুক্তাকীনদের বৈশিষ্ট্যই হবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা। আর তখনই তারা কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারবে।

তৃতীয় গুণ ঃ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ "তাদেরকে যে রুযি দেয়া হয়েছে তা থেকে তারা ব্যয় করতে থাকে।" অর্থাৎ মুত্তাকীনদের তৃতীয় গুণ হলো আল্লাহর পথে ব্যয় করা। 'ইনফাক' তথা দান করা বলতে যাকাত ও সাদকা উভয়কে বুঝায়। যাকাত ফরয হবার আগেই সাধারণত দান সাদকার বিধান চালু হয়েছিলো। পরে যাকাত একটা আলাদা বাধ্যতামূলক

www.pathagar.com

বিষয় হিসেবে বিধান অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণ দান সাদকাহও এর পাশাপাশি চালু থাকে। রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেন ঃ "মানুষের ধন সম্পদে যাকাত ছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।" সূরা বাকারার এই আয়াত যাকাত ফরয হবার আগেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই এই আয়াতে যাকাত ছাড়াও যাবতীয় দান সাদকা যেমন, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য দান করা। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। ফকীর, মিসকিন, মুসাফির অসহায় নারী পুরুষকে সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে নিজের যে রুযি আছে তা থেকেই যতটুকু সম্ভব দান করা। তবে নিজের পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যাতে তারা তাদের হক থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়।

চতুর্থ গুণ ঃ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ـ "যারা (হে নবী!) আপনার ওপর এবং আপনার আগের নবীদের ওপর নায়িলকৃত ওহীর (কিতাবের) ওপর ঈমান রাখে" এখানে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীনদের চতুর্থ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঐ সব মানুষও মুত্তাকীনদের দলভুক্ত যারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকার করে এবং তার আগে পাঠানো অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল প্রভৃতিকেও আল্লাহরই পাঠানো আসমানী কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করে। সুতরাং যারা আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে কিন্তু তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীলকে স্বীকার করে না, তারা মুসলমান হতে পারে না। তবে সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কুরআনের পূর্বের কিতাবগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এসবগুলোর বিধানের ওপর আমল করা জরুরি ছিলো। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হবার পর অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহকাম মানসুখ বা রহীত হয়ে গেছে। তাই এখন আমল একমাত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী করতে হবে। তবে অবশ্যই পূর্বের কিতাবকে হক ও সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

যদি মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য এরূপই হয়, তা হলেই তারা কুরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারবে।

পঞ্চম গুণ ঃ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ "তারা পরকালের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে"। এটা হচ্ছে মুত্তাকীনদের ৫ম এবং সর্বশেষ

বৈশিষ্ট্য। 'আখেরাত' বা 'পরকাল' একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটা কয়েকটা মৌলিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন ঃ-

এক. মানুষ এ জগতে দায়িত্বহীন নয় বরং নিজের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককেই (আল্লাহর কাছে) নিজ নিজ দায়িত্বের জবাবদিহী করতে হবে।"।

দুই. দুনিয়ার এ জগৎ চিরস্থায়ী নয় বরং এক সময় (কিয়ামত) যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই, এটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমাপ্তি ঘটবে।

তিন. এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আল্লাহ্ তাআলা আর একটি জগৎ সৃষ্টি করবেন। সেখানে সকলকেই পুনরায় জীবন দান করে (হাশরের ময়দানে) তার দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ নেবেন এবং প্রত্যেককেই তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

চার. আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক যারা সৎ ও নেককার হিসেবে গণ্য হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা অসৎ ও গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে।

পাঁচ. বর্তমান দুনিয়ার স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতাই মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড নয়। বরং প্রকৃত পক্ষে শেষ বিচারের দিন যে সফলতা লাভ করবে সেই সফল হবে। আর যে ব্যর্থ হবে সেই চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হবে।

সুতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়কে যদি কেহ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাহলেই তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে।

মুত্তাকীনদের উপরোক্ত পাঁচটি গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো বলা হলো তা মূলতঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

এই আয়াতে উপরোক্ত গুণের অধিকারী মুত্তাকীনদের সফল পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত গুণাবলীতে ভূষিত ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র

www.pathagar.com

তাদের প্রতিপালকের পছন্দনীয় ও প্রদর্শিত পথে রয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে চরম সফলতা লাভ করবে।

দুনিয়াতে সবশ্রেণীর লোকজনই মুত্তাকীনদেরকে শ্রদ্ধার এবং সম্মানের পাত্র বলে মান্য করে ও বিশ্বাস করে। আর পরকালেও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে।

শিক্ষা ঃ সূরা বাকারার ১-৬ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর তা থেকে আমরা যে সব বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি তা হলো এই যে–

● + সূরার প্রথমে الٓمّٓ এর মতো যে সব বিচ্ছিন্ন অক্ষর রয়েছে, যার অর্থ প্রকাশিত নয়। তার অর্থ এবং তাৎপর্য খুজে বেড়ানো যাবে না এবং মনের মধ্যে খুৎখুতেভাব সৃষ্টি করা যাবে না।

● গায়েবের প্রতি বিনা প্রশ্নে বিনা যুক্তিতে ইমান রাখতে হবে।

● পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল মুসলমান নারী-পুরুষ কে নামায পড়ার মাধ্যমে নামায প্রতিষ্ঠার যে দাবী তা পূরণ করতে হবে। এ জন্য নিজের পরিবারের সকলকে নামাযী বানাতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েমের জন্য কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকতে হবে।

● আল্লাহ আমাদেরকে যে রুযি দিয়েছেন তা থেকেই সাধ্যমত খরচ করতে থাকতে হবে। কোন ভাবেই অসৎ পথে বা কাজে ব্যয় করা যাবে না। আর অর্থ-সম্পদ জমানোর জন্য বখিল হওয়াও যাবে না। (৫) আল কুরআন সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তবে কুরআনের বিধান ছাড়া অন্য কিতাবের বিধান মানা যাবে না।

● আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ও মজবুত বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো রকম সন্দেহ বা দোদুল্যমান ভাব দেখানো যাবে না।

● সর্বশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো দুনিয়ার সফলতাকে প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী সফলতা মনে করা যাবে না বরং আখেরাতের সফলতাকেই প্রকৃত এবং স্থায়ী সফলতা মনে করতে হবে।

আহ্বান ঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদের সামনে সূরা বাকারার ১ম থেকে যে কয়েকটি আয়াতের দারস পেশ

www.pathagar.com

করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর মুত্তাকীনদের যে সব গুণের কথা আলোচনা করা হলো আমরাও যেনো সেই গুণে গুণান্বিত হয়ে চূড়ান্ত এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন।

অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বুল আলামিন। আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ।

www.pathagar.com

দুই

মু'মিনদের গুণাবলী

সূরা মু'মেনূন ১-১১ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ
خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى
وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى
صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১) অবশ্যই (সেই সব) মু'মিনেরা সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা তাদের নামাযে বিনয়ী-নম্র। (৩) যারা বাজে বা বেহুদা কথা-কাজ থেকে দূরে থাকো, (৪) যারা তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে কর্মতৎপর। (৫) এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ ব্যবহার থেকে) হেফাজত করে। (৬) তবে তাদের স্ত্রীদের এবং অধিনস্থ দাসীদের বেলায় (যৌনাঙ্গ) হেফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) তবে কেউ যদি এদের ছাড়া অন্য কাউকে (যৌনক্ষুধা

মেটার জন্য) কামনা করে, তবে (এক্ষেত্রে) তারা হবে সীমালংঘনকারী। (৮) আর যারা তাদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে হুশিয়ার থাকে। (৯) এবং যারা তাদের নামায সমূহকে যথাযতভাবে সংরক্ষণ করে। (১০) তারাই (অর্থাৎ এসব গুণের অধিকারীরাই) হবে উত্তরাধিকারী। তারা শীতল ছায়াঢাকা উদ্যানের (অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউসের) উত্তরাধিকারী হবে এবং তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ

قَدْ – অবশ্য। اَفْلَحَ – সফলকাম হয়েছে বা পরিত্রান পেয়েছে। اَلْمُؤْمِنُوْنَ –মুমিনরা। اَلَّذِيْنَ –যারা। هُمْ –তারা। صَلَاتِهِمْ তাদের নামায। خٰشِعُوْنَ বিনয়ীরা। وَ এবং। هُمْ – তাদের। عَنْ – হতে। اللَّغْوِ – বেহুদা বা অনর্থক। مُعْرِضُوْنَ অগ্রাহ্যকারী, প্রত্যাবর্তনকারী। لِ –জন্য। الزَّكٰوةِ – যাকাত বা পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা। فٰعِلُوْنَ – কাজ সম্পাদনকারী। فُرُوْجِهِمْ – তাদের যৌনাঙ্গ। حٰفِظُوْنَ – সংরক্ষণকারীরা। اِلَّا – ছাড়া। عَلٰى – উপর। اَزْوَاجِهِمْ – তাদের স্ত্রীরা। اَوْ – অথবা। مَا – সাথে। مَلَكَتْ – মালিকানাভুক্ত (দাসী)। اَيْمَانُهُمْ তাদের ডান (হাতের)। فَ – অতঃপর। اِنَّهُمْ – নিশ্চয় তারা। غَيْرُ – ব্যতিরেকে বা বাদে। مَلُوْمِيْنَ – তিরস্কৃত হবে। مَنْ – যে। ابْتَغٰى – কামনা করে। وَرَاءَ – অন্যকে । فَاُولٰئِكَ – অতঃপর ওরা। الْعٰدُوْنَ – সীমালংঘনকারীরা। اَمٰنٰتِهِمْ – তাদের আমানতসমূহ। عَهْدٌ – ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। رٰعُوْنَ – সংরক্ষণ করে। صَلَوٰتِهِمْ – তাদের নামাযসমূহ। يُحَافِظُوْنَ – তারা হেফাজত করে। اُولٰئِكَ – ওরাই। الْوٰرِثُوْنَ – উত্তরাধিকারীরা। يَرِثُوْنَ – তারা উত্তরাধিকারী হবে। الْفِرْدَوْسَ – শিতল ছায়াযুক্ত বাগান (সর্ব শ্রেষ্ঠ জান্নাতের নাম)। فِى – মধ্যে। هَا – তা। خٰلِدُوْنَ তাতে চিরদিন থাকবে।

সম্বোধন ঃ উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ্।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের দারস পেশ করার জন্য আমি সূরা মু'মিনুনের ১-১১ নং আয়াত পর্যন্ত মোট ১১টি আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং সাথে সাথে তরজমাও পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে সঠিকভাবে দারস পেশ করার এবং শোনার তৌফিক দান করুন। অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্। [দরস পেশ করার সময় এভাবে উপস্থিত শ্রোতাদের সম্বোধন করবেন।]

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ এর 'আল-মু'মেনুন' মব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যদিও নামকরণের ক্ষেত্রে সব বিষয়ের সাথে মিল রেখে শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু এই সূরার ১ম থেকে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত একই সাথে মু'মিনদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে যেসব গুণের কথা পেয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, এই সূরার বিষয়ের সাথে নামকরণের বেশ মিল আছে।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরার বর্ণনাভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণ হয় যে, এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়েছিলো। বিধায় সুরাটি মাক্কী। হযরত ওমর (রাঃ) এর এক উক্তি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়- এ সময় হযরত উমর (রাঃ) সবেমাত্র ঈমান এনেছিলেন। আর হযরত উমরের ইসলাম কবুলের সময় ছিলো রাসূল (সাঃ) এর নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকে। এ হাদীসে হযরত উমর (রাঃ) নিজে বলেন ঃ "এ সূরাটি তার সামনেই নাযিল হয়েছে। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় তা দেখতে পান। পরে নবী করীম (সাঃ) যখন সেই অবস্থা থেকে অবসর পেলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ "এইমাত্র আমার প্রতি এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যদি কেউ তার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে তবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে চলে যাবে।" অতঃপর তিনি এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শুনালেন। (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম।)

সূরাটি নাযিলের সময় মক্কায় রাসূল (সাঃ) এর সাথে কাফেরদের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব

www.pathagar.com

চলছিলো। তবে তখনো কাফেরদের যুলুম নির্যাতনের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাছাড়া সূরাটি নাযিলের সময় মক্কায় চরম দুর্ভিক্ষও চলছিলো।

বিষয়বস্তু ঃ এই সূরাটির মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য।

তিলাওয়াতকৃত ১১টি আয়াতের মূল বিষয় হচ্ছে, যেসব লোক এই নবীর কথা মেনে নেবে, তাদের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টি হবে। আর নিঃসন্দেহে এসব লোকেরাই দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে।

সূরার বিশেষ বৈষিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মুসনাদে আহমদ কিতাবের এক বর্ণনায় হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন পাশের লোকজনের কানে ঘন্টার ধ্বনি বা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো আওয়াজ হতো। একদিন তাঁর কাছে এমনি ধরনের আওয়াজ পেয়ে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শুনার জন্য থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং এই দোআ পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضَ عَنَّا وَاَرْضِنَا

"হে আল্লাহ আমাদের বেশী বেশী দাও– কম দিও না। আমাদের সম্মান বাড়িয়ে দাও– লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান করো মাহ্রূম করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অীধকার দাও– অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি রাযি-খুশী থাকো আর আমাদেরকে তোমার রাযীতে রাযী করো।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ এখনই আমার উপর যে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যে কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। এরপর তিনি এই সূরার ১ম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

ইমাম নাসায়ী তাঁর কিতাবের তাফসীর অধ্যায়ে ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চরিত্র কেমন ছিলো? তিনি (আয়েশা) বলেছিলেন ঃ তাঁর চরিত্র আল কুরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর

www.pathagar.com

তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এগুলোই ছিলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র। (ইবনে কাসীর)

পটভূমিঃ অত্র সূরা বিশেষ করে এই আয়াতগুলো নাযিলের সময় প্রেক্ষাপট ছিলো এই যে, এ সময় একদিকে মক্কার কাফের সর্দারেরা ইসলামী দাওয়াতের চরম বিরোধী ছিলো। তাদের ব্যবসা-বানিজ্য ছিলো উন্নতমানের এবং চাকচিক্য পূর্ণ। তাদের টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ ছিলো প্রচুর। দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দের সব উপায় উপকরণ তাদের নাগালের মধ্যে ছিলো। আর অপরদিকে ছিলো ইসলামের অনুসারী রাসূলের সংগী-সাথীরা। এদের মধ্যে কিছু লোক যারা স্বচ্ছল ছিলো এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা আগে থেকেই সাফল্য মণ্ডিত হচ্ছিলো। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত কবুল করার ফলে কাফেরদের চরম বিরোধিতার কারণে তাদেরকে খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। এতে কাফের সর্দারেরা নিজেদেরকে বেশী সফল ও সার্থক বলে দাবী করতো এবং নবীর অনুসারীদেরকে বিফল ও ব্যার্থ মনে করতো। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, নিশ্চয়ই কল্যাণ বা সফলতা লাভ করেছে ইসলামের দাওয়াত কবুলকারী রাসূলের অনুসারীরা। আর কাফেরেরা দুনিযায় যে সফলতা এবং স্বার্থকতার দাবী করছে, এটাই প্রকৃত সফলতা ও স্বার্থকতা নয়, বরং আখেরাতের সফলতাই হলো প্রকৃত এবং স্থায়ী সফলতা।

ব্যাখ্যা ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ – "অবশ্য অবশ্যই ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা কল্যাণ বা সফলতা লাভ করেছে।"

মু'মিন কারা ঃ এখানে ঈমান কবুলকারী বা মু'মিন বলে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করেছে, তাঁকে যারা নিজের মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর উপস্থাপিত জীবন যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে প্রস্তুত হয়েছে।

فَلَحٌ (ফালাহ) শব্দের মানে-কল্যাণ, সাফল্য এবং স্বাচ্ছন্দ। এটা خُسْرٌ । (খুশরান) বা ক্ষতি বা ব্যর্থতার বিপরীত। সাফল্য শব্দটি কুরআন এবং হাদীসে ব্যাপক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আযান ও একামতে প্রতিদিন পাঁচবার প্রতিটি মুসলমানকে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে সাফল্যের দিকে

www.pathagar.com

ডাকা হয়। এর প্রকৃত অর্থ হলো প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়া এবং প্রতিটি কষ্ট দূর হওয়া। এ শব্দটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর অর্থ সুদূর প্রসারী। দুনিয়ার কোন মানুষ বা শক্তির পক্ষে মানুষের প্রতিটি মনোবাঞ্ছা পূরণ করা এবং প্রতিটি কষ্ট বিদূর করা সম্ভব নয়। এটা পারেন একমাত্র বিশ্ব জাহানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাবারাকাওয়া তাআলা।

পুরোপুরিভাবে সফলতা লাভ করা দুনিয়াতে কোনভাবেই সম্ভব নয়। এটা একমাত্র আখেরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যমেই হতে পারে। কুরআন এবং হাদীসে যেখানেই এই 'ফালাহ' বা সফলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে- তা চিরস্থায়ী আখেরাতের সফলতার কথাই বলা হয়েছে। এখানেও মক্কার কাফের সর্দারদের দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরত্তর সফলতার বড়াই এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ তোমরা দুনিয়ার যে সফলতা এবং স্বার্থকতার বড়াই করছো এটাই প্রকৃত সফলতা বা স্বার্থকতা নয়। তোমাদের এই সফলতা ক্ষণস্থায়ী। বরং মুমিন লোকদের জন্য আখেরাতের যে সফলতা সেটাই হচ্ছে প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী সফলতা।

বর্তমানে আমাদের সমাজেও অনুরূপ লোক দেখা যায়। প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরত্তর উন্নতির জন্য এবং নিজের সন্তানদের লেখা-পড়ার ভাল ফলাফল ও দামী চাকুরী পাবার কারণে নিজেকে সফল হয়েছে বলে বড়াই করে। অথচ আখেরাতের জন্য সে কোন কাজই করে না। তাদের দুনিয়ায় এ ধরনের বড়াই পরকালে কোনো কাজেই আসবে না। বরং তারাই ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যারা মুমিন, ইসলামের পথে চলার জন্য দুনিয়ায় বাধাগ্রস্ত হয়ে কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয়েছে, বাতিলের বিরোধিতা এবং হামলার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরী-বাকরী ক্ষতি হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তারাই আখেরাতে নেয়ামতে ভরা জান্নাত লাভের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করবে।

আল-কুরআনে অন্যত্র সূরা আ'লায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা পত্র দিতে গিয়ে বলা হয়েছে – قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ "যে নিজেকে পাপ কাজ থেকে পবিত্র রেখেছে সেই সফলকাম হয়েছে।" এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জায়গা আসলে দুনিয়া নয় পরকাল। যে সফলতা কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত

থাকা নায়। এ সম্পর্কে সূরা আ'লায় আরো বলা হয়েছে–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(হে মানুষ!) "তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছো। অথচ দুনিয়ার তুলনায় পরকালের জীবন অতি উত্তম এবং স্থায়ী।"

সুতরাং পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী সফলতা তো একমাত্র পরকালে জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে– দুনিয়া এর স্থান নয়। তবে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের মনের প্রশান্তির মাধ্যমে সফলতা দান করে থাকেন।

মু'মিনদের সাতটি গুণ

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা সেই সব মু'মিনদেরকে সফলতা দানের ওয়াদা করেছেন যাদের মধ্যে সাতটি গুণ রয়েছে। সর্ব প্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় এটাকে এই সাতটি গুণের মধ্যে শামিল না করে পর পর সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। নীচে সেগুলো ধারাবাহীকভাবে আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম গুণ ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।" নামাযে 'খুশূ' বলতে বিনয়-নম্র হওয়া বুঝায়। 'খুশূর' আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়াতের পরিভাষায় এর মানে অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনা অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থির থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। (বয়ানুল কুরআন)। তাছাড়া এর আরো অর্থ হলো কারও সামনে বিনয়াবনত হওয়া, বিনীত হওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া, নিজের কাতরতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

দেলের 'খুশূ' হয় তখন, যখন কারও ভয়ে ও দাপটে দেল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আর দেহের 'খুশূ' এভাবে প্রকাশ পায় যে, কারও সামনে গেলে তার মাথা নীচু হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, চোখের দৃষ্টি নতো হয়ে আসে, গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যায়।

ভীত সন্ত্রস্ত হবার সেসব লক্ষণই বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহাশক্তির প্রচণ্ড দাপটের অধিকারী কোনো সত্তার সামনে হাজির

www.pathagar.com

হয়। আর নামাযে 'খুশূ' বলতে বুঝায় মন ও দেহের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে। কেননা নামাযী তার মহাশক্তিধর প্রভুর সামনে হাজির হয়।

নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা বা খুশূ-খুজু পয়দা হবার জন্য নামাযের বাহ্যিক কাজেরও বেশ প্রভাব রয়েছে। ইসলামী শরীয়াতে নামাযের যেগুলো নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুন হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা যথাযত ভাবে নিষ্ঠার সাথে আদায় করলে মনের একাগ্রতা বা খুশূ সৃষ্টির জন্য সাহায্য করে। আবার সেসব কাগুলো ঠিকমত না করলেও নামাযের একাগ্রতা ও খুশূ সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

নামাযের যেসব বাহ্যিক কাজ নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ পয়দায় বাধা সৃষ্টি করে তা হলোঃ

❑ নামাযের মধ্যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলা বা নড়া-চড়া করলে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- একবার নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে মুখের দাড়ী নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ

لَوْ خَشِعَ قَلْبُهُ خَشِعَتْ جَوَارِحِهِ

"যদি এ লোকটির দেলে খুশূ থাকতো তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরেও খুশূ বা স্থিরতা থাকতো।" (মাযহারী)

❑ নামাযে এদিক ওদিক তাকালে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়। বুখারী এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সাঃ) কে নামাযে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ

هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"এটা নামাযীর (মনোযোগের) উপর শয়তানের থাবা।"

❑ নামাযে ছাদ বা আকাশের দিকে তাকালে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ اَوْلَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ

"লোকেরা যেনো নামাযে তাদের চোখকে আকাশমুখী না করে। (কেননা তাদের চোখ) তাদের দিকে ফিরে নাও আসতে পারে।" (অর্থাৎ নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট করে দিবে।)" (মুসলিম)।

❑ নামাযে হেলা-দোলা করা ও নানা দিকে ঝুকে পড়লে নামাযের একাগ্রতা বা খূশূ নষ্ট হয়ে যায়।

❑ পরনের জামা-কাপড় বারবার গুটানো বা ঝাড়া কিংবা তা নাড়াচাড়া করলে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়।

❑ সিজদায় যাবার সময় বসার জায়গা বা সিজদাহর জায়গা বারবার পরিষ্কার করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। (তবে ক্ষতিকারক হলে একবার সরানো যাবে)

এসম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى، فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهٗ

"কোন ব্যক্তি যেন নামাযের অবস্থায় (সিজদাহর জায়গা হতে) কংকর না সরায়। কেননা আল্লাহর রহমত নামাযী ব্যক্তির সামনে প্রসারিত হয়। (আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ও ইবনে মাযাহ)।

❑ একটানা ভাবে গর্দান খাড়া করে দাঁড়ানো, খুব কর্কষ সূরে কোরআন পাঠ করা কিংবা গীতের সূরে কেরআত পাঠ করলে নামাযের খুশূ বা বিনয়তা নষ্ট হয়ে যায়।

❑ জোরে জোরে হাই এবং ঢেকুর তোললে, ইচ্ছা করে গলা খেকাড়ী বা কাশি দিলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়। হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

"নামাযে হাই উঠে শয়তানের প্রভাব থেকে। যদি কারো হাই উঠে তবে সে যেনো সাধ্যমত হাই প্রতিরোধ করে।" (মুসলিম, তিরমিযী)।

www.pathagar.com

❐ খুব তাড়াহুড়ো করে নামায আদায় করলে নামাযের বিনয়তা বা একাগ্রতা থাকে না। এ সম্পর্কে "হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) 'মুখতাসির' (অর্থাৎ নামাযের কাজগুলোকে হাল্কা ও ঝটপট) রূপে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"

❐ নামাযের রুকু, সিজদাহ, কিয়াম, বৈঠক সঠিকভাবে আদায় না করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়। হাদীসে আছে "নোমান ইবনে মোররাহ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ মদখোর, ব্যভিচারী ও চোর সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? তারা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি (সাঃ) বললেন ঃ ওগুলো কবীরা গোনাহ এবং এর সাজাও খুব। (এবার শুনে নাও) সবচেয়ে জঘন্য চুরি হলো সেই চুরি যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে আবার চুরি কিভাবে হয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ যে নামাযে রুকু ও সেজদাহ্ ঠিকমত করে না" (মালেক, আহমদ, দারেমী, মেসকাত)

❐ নামাযীর সামনে পর্দায় কোন ছবি বা সিনারী থাকলে নামাযের খুশূ বা একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। "হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি কাপড়ের পর্দা ছিলো তিনি তা ঘরের একদিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এতে নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি এ পর্দাটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে রাখো। কারণ এর ছবিগুলো সর্বদা আমার নামাযের ক্ষতি (অর্থাৎ একাগ্রতা নষ্ট) করে।" (বুখারী)

অন্তরের যেসব কাজ নামাযের খুশূ বা একাগ্রতা নষ্ট করে তাহলো ঃ

❐ নামাযের মধ্যে জেনে শুনে অপ্রাসংগিক কথা-বার্তা চিন্তা বা খেয়াল করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে অনিচ্ছাসত্ত্বে কোনো চিন্তা ভাবনা মনে জাগলে তা জাগতে পারে। মানুষের এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা শয়তান মানুষের মনে আসওয়াসা দিয়ে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করার জন্য সদাসর্বদা চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) হাদীসে বলেন ঃ "নামাযের জন্য যখন আযান দেয়া হয় তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে বাতকর্ম করতে করতে পালাতে থাকে– যাতে সে আযানের ধ্বনি না শুনতে পায়। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায় তখন সে ফিরে

www.pathagar.com

আসে। আবার যখন একামত বলা হয় তখন সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন একামত শেষ হয়ে যায় তখন ফিরে আসে ও মানুষের মনে (একাগ্রতা নষ্ট করার জন্য) খটকা দিতে থাকে। সে বলে ঃ অমুক বিষয়ে খেয়াল করো, অমুক অমুক বিষয়ে খেয়াল করো– যেসব বিষয় তার মনে ছিলো না। অবশেষে নামাযী এরূপ (অমনোযোগী) হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাকাআত নামায পড়েছে।" (আবু হুরাইরা, বুখারী, মুসলিম)।

নামাযে অন্তরের খুশূ বা একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য যেসব কাজ করতে হবে–

❐ নামাযে সব সময় আল্লাহ তাআলাকে হাজির-নাজির জানতে হবে। নামাযী যখন নামাযে দাঁড়বে তখন সে মনে করবে যেনো সে আল্লাহর সামনে হাজির হয়েছে। এ সম্পর্কে "হাদীসে জিবরীলে" 'ইহ্সান' সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) কে জিবরাঈল (আঃ) প্রশ্ন করলে, তার প্রতিউত্তরে তিনি বলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

"তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদাত (নামায আদায়) করবে, যেন তুমি স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাচ্ছো; আর যদি তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না হয়, তবে তুমি অবশ্যই মনে করে নিবে যে, আল্লাহ তোমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন।" (হযরত উমর, মুসলিম)।

❐ নামাযে যেসব দোআ-কালাম পড়া হয় তা অন্তর থেকে পড়তে হবে। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে ধীর-স্থিরভাবে পড়তে হবে। নামাযে অন্য মনস্ক হয়ে গেলে যখনই খেয়াল হবে তখনই মনকে পুনরায় নামাযের মধ্যে আনতে হবে। সদাসর্বদা এ চেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে।

❐ নামাযে মনোনিবেশ বা খুশূ সৃষ্টি করার জন্য নামাযীর দৃষ্টি সেজদার দিকে থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "হে আনাস! যেখানে তুমি সেজদাহ্ দেবে সেই জায়গাতেই তোমার দৃষ্টি রাখবে।" (বায়হাকী, মেশকাত)

❐ নামাযে মনোনিবেশ সৃষ্টির জন্য নামাযে যা পড়া হবে তার অর্থ নিজের ভাষায় জানতে হবে। দোআ-কালামের মানে জানলে স্বাভাবিকভাবেই নামাযে মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

প্রিয় ভায়েরা মুমিনদের গুণাবলীর প্রথম গুণ নামাযে খুশূ বা বিনয়ী বা একাগ্রতার বিষয়টি এতো দীর্ঘ আলোচনার কারণই হলো একজন মু'মিনে বান্দার প্রথম গুণই হবে নামায আর নামাযের রূহ বা প্রাণই হলো নামাযে খুশূ-খুজু বা একাগ্রতা। যদি তা না হয় তাহলে নামায পড়াই হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এজন্য আমাদের নামায পড়তে হলে খুশূ-খুজুর সাথেই নামায আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ "যারা বেহুদা বা অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কাজ থেকে দূরে থাকে।"

মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হলো তারা বেহুদা, অপ্রয়োজনীয় ও অকল্যাণকর কথা, কাজ এবং চিন্তা থেকে দূরে থাকে।

لَغْوٌ (লাগয়ুন) বলা হয় এমন প্রতিটি কাজ এবং কথাকে যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং নিষ্ফল। যেসব কথা এবং কাজের কোনই ফল নেই; উপকার নেই, যা থেকে কল্যাণবহ ফলও লাভ করা যায় না। যার কোনো প্রয়োজন নেই, যা হতে কোনো ভালো উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না– এসবই অর্থহীন, বেহুদা ও বাজে জিনিস।

مُعْرِضُوْنَ মানে যদিও দূরে থাকা। কিন্তু এতে শব্দটির পূর্ণ অর্থ বুঝায় না। আয়াতটির পূর্ণ অর্থ হলো ঃ তারা বাজে, বেহুদা কাজ বা জিনিসের দিকে লক্ষ্য করে না। সেদিকে যায় না। যেখানে এ ধরনের কাজ বা কথা হয় সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। সেখানে যাওয়া হতে দূরে থাকে। সে কাজে অংশগ্রহণ করে না, পরহেয করে, পাশ কেটে চলে যায়, কোথাও কখনও মুখোমুখী হয়ে পড়লেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য এড়িয়ে চলে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

"তারা যদি এমন কোনো স্থানে যেয়ে পড়ে যেখানে বেহুদা অর্থহীন বাজে কাজ বা কথা হচ্ছে, তা হলে সেখান থেকে তারা নিজের মান সম্মান রক্ষা করে চলে যায়।" (ফুরকান-৭২)

আসলে মুমিন ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রতিটি সময় হিসাব-নিকাশ করে চলে। কেননা আল্লাহ তাআলা তার

www.pathagar.com

প্রতিটি মূহূর্তের হিসাব নেবেন। মুমিনের জন্য প্রতিটি মূহূর্ত একজন পরিক্ষার্থীর মতো মূল্যবান। পরীক্ষার্থী যেমন পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল লাভের জন্য প্রতিটি প্রশ্নের যথাযত উত্তর দেবার মাধ্যমে প্রতিটি মূহূর্তকে কাজে লাগায়, সে আজেবাজে কথা লিখে বা চিন্তা করে সময় কাটায় না। অনুরূপভাবে একজন মুমিন ব্যক্তিও দুনিয়ার এ জীবনের প্রতিটি মূহূর্তকে সঠিকভাবে ও যথাযতভাবে কাটায়। সে চিন্তা করলে কল্যাণকর চিন্তা করে, কথা বললে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য কথা বলে, কাজ করলে উপকারী কাজ করে। সে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা ও চোগলখোরী করে বেড়ায় না। সে হাটে-বাজারে, দোকানে বা রাস্তায় বসে বাজে আড্ডা দেয় না। সে বাজে বা অশ্লীল কোন কাজ করে না। সে গল্প করে, কিন্তু অর্থহীন অশ্লীল গল্প-গুজব করে না। সে হাসি-তামাসা ও রসিকতা করে, কিন্তু তাৎপর্যহীন হাসি-তামাসা ও রসিকতা করে না। সে বিতর্ক করে, কিন্তু অশ্লীল কথা ব্যবহার করে ঝগড়া বিবাদ করে না। সে যে সমাজে গান-বাজনা, রং-তামাসা, অশ্লীল গালি-গালাজ, অন্যায় অভিযোগ, মিথ্যা দোষারোপ, লজ্জাহীন কথা-বার্তার চর্চা হয় সেই সমাজ তার জন্য গাত্রদাহ এবং আযাব বলে মনে হয়। এসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ اِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ "মানুষ যখন অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি ত্যাগ করে তখন তার (দ্বীন) ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে থাকে।" একারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব বান্দাহ্দের জন্য জান্নাতে আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হলো–

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً

"সেখানে তারা কোনো প্রকার অর্থহীন বাজে কথা-বার্তা শুনতে পাবে না।" (সূরা গাশিয়া)

তৃতীয় গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ অর্থাৎ "যারা যাকাত বা পবিত্রতার কাজে কর্মতৎপর।" 'যাকাত' দেয়া এবং 'যাকাতের' পন্থায় কর্মতৎপর হবার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই আয়াতে

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুরআনের প্রচলিত وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বা وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এর কথা না বলে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলে বিশেষ ধরনের কথা বলা হয়েছে। এটা বলার পেছনে বেশ তাৎপর্য রয়েছে।

আরবী ভাষায় زَكٰوةٌ শব্দের দু'টি অর্থ– একটি 'পবিত্রতা' আর অপরটি 'বৃদ্ধি'। অর্থাৎ একটা জিনিসের উন্নতি লাভের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি আছে, তা দূর করা এবং উহার মূল জিনিসকে বৃদ্ধি করা। এ দুটি ধারণার সমন্বয়ে 'যাকাত' সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হয়।

আর ইসলামী পরিভাষায় উহার ব্যবহার হয় দু'টি অর্থে। একটি সেই মাল-সম্পদ, যা পবিত্রতা অর্জনের জন্য হিসাব করে আলাদা করা হয়। আর দ্বিতীয়টি খোদ এই পবিত্রতা অর্জনের কাজ। যদি يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বলা হয়, তবে তার অর্থ হবে, তারা পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের মাল-সম্পদের একটা অংশ দেয়। এতে শুধু মাল দেয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থকে। কিন্তু যদি বলা হয় لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ তবে তার অর্থ হবে তারা পবিত্রতা বা তায্‌কিয়ার বিধানের কাজ করছে। এতে কেবলমাত্র যাকাত আদায় করার অর্থই বুঝাবে না; বরং এর মানে ব্যাপক অর্থে বুঝাবে। যেমন–

✱ সে তার মন ও দেহের পবিত্রতা অর্জন করে।

✱ সে তার চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন করে।

✱ সে তার জীবনের পবিত্র-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে।

✱ সে তার পরিবারকে পবিত্র বা তায্‌কিয়া করে।

✱ সে সমাজ এবং রাষ্ট্রকে তায্‌কিয়ার কাজে ভূমিকা রাখে।

✱ আর সে তার ধন-সম্পদেরও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধন-সম্পদের পবিত্রতা অর্জন করে। ইত্যাদি।

মোট কথা মুমিন ব্যক্তি সে তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং ধন-সম্পদের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এক কথায় সে নিজেকেও পবিত্র করে এবং অন্য লোককেও পবিত্র করার কাজ আঞ্জাম দেয়। আল্লাহ তাআলা সূরা আ'লায় বলেন ঃ

www.pathagar.com

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىؕ

অর্থাৎ "কল্যাণ ও সফলতা লাভ করলো সে, যে পবিত্রতার কাজ করলো এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়লো।" আল্লাহ্ তাআলা সূরা শামসে আরও বলেন : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ "সফলকাম হলো সে, যে নিজের নফসকে পবিত্র বা তায্কিয়া করলো। আর ব্যর্থ হলো সে, যে নিজেকে কলুষিত করলো।

তবে আলোচ্য আয়তটি এ দু'টি আয়াত থেকে বেশী অর্থপূর্ণ। কেননা এ দু'টি আয়াতে শুধুমাত্র নিজের নফসের পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে নিজের এবং গোটা সমাজ জীবনের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ : وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।" মুমিনদের চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদের স্ত্রী এবং অধীনস্থ দাসীদের ছাড়া সব রকমের নারী ভোগ থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

حٰفِظُوْنَ এর দু'টি অর্থ রয়েছে– (১) নিজের দেহের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে, উলঙ্গপনাকে প্রশ্রয় দেয় না এবং নিজের লজ্জাস্থানকে অপর লোকের সামনে প্রকাশ করে না। (২) তারা নিজেদের পবিত্রতা ও সতীত্বকে রক্ষা করে।

اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ

অর্থাৎ "তবে যদি তারা তাদের স্ত্রী এবং মালিকানাধীন দাসীদের সাথে যৌন কামনা পূরণ করে তবে তারা তিরস্কৃত হবে না।" তবে এখানে একটা ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে রাখতে হবে– জীবনের লক্ষ্য বানানো যাবে না। মাঝখানে একথা বলার আসল উদ্দেশ্য হলো– লজ্জাস্থানের 'হেফাজত' করার কথা বলার ফলে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক শ্রেণীর লোক আছে যারা যৌন শক্তিকে একটা খারাপ কাজ মনে করে। তারা মনে করে দ্বীনদার এবং পরহেজগার লোকদের জন্য এ খারাপ

www.pathagar.com

কাজ করা ঠিক নয়। যদি "সফলকামী ঈমানদার লোকেরা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে" এই কথা বলেই ক্ষান্ত হতো তা হলে প্রচলিত এই ভূল ধারণাকে সাপোর্ট দেয়া হতো। তাই মাঝখানে আল্লাহ তাআলা একথা বলে এটা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, নিজের স্ত্রীদের এবং শরীয়ত সম্মত অধীনস্থ দাসীদের সাথে যৌন খাহেস পূরণ করলে কোনো দোষের কাজ হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ অর্থাৎ "বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়ত সম্মত দাসীর সাথে শরীয়াতের নিয়মানুযায়ী যৌন কামনা-বাসনা পূরণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ বৈধ নয়। আর যারা একাজ করে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" যেমন–

* যিনা যেমন হারাম, তেমনি হারাম নারীকে বিয়ে করাও যিনার মধ্যে গণ্য হবে।

* স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা হারাম।

* পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে যৌন ক্ষুধা মিটানো হারাম।

* অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে হস্ত মৈথুনও এর অর্ন্তভূক্ত।

* তাছাড়া যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করার মতো কোনো অশ্লীল কাজ করা। এসব কিছুই সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য হবে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের আমানতসমূহ এবং ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"

এখানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দু'টি গুণের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম গুণ ঃ اَمَانَتْ 'আমানাত' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর আভিধানিক অর্থে এমন প্রতিটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা রাখা যায় ও ভরসা করা যায়। এখানে অনেক বিষয় জড়িত বিধায় 'আমানাত' শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এতে দু' ধরনের আমানত সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে।

(১) হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র হক সংক্রান্ত আমানত।

(২) হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক সংক্রান্ত আমানত।

● **হুক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক সংক্রান্ত আমানত হলো-**

(১) খেলাফত বা প্রতিনিধি সংক্রান্ত আমানাত। আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে তার খেলাফতের দায়িত্বের আমানাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ সূরা বাকারায় বলেন- إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً "নিশ্চয় আমি (মানুষকে) আমার প্রতিনিধি হিসাবে (দুনিয়াতে) পাঠাতে চাই।" সুতরাং আল্লাহ্র এই খিলাফতের আমানত রক্ষা করা প্রতিটি বান্দার জন্য বড় ধরনের দায়িত্ব।

(২) শরীয়াতে আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্র হক। বিধায় তা ঠিকমত পালন করা এবং যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা হলো আল্লাহ্র হকের আমানত।

● **বান্দার হক বা অধিকার সংক্রান্ত আমানত হলো-**

(১) টাকা-পয়সার আমানত। যদি কেউ কারো কাছে টাকা-পয়সা আমানাত হিসেবে জমা রাখে তাহলে তা ঠিকমত হেফাজাত করা এবং চাওয়ামাত্র কোন প্রকার গড়িমসি না করে তাৎক্ষণিক ফেরৎ দেয়া।

(২) ধন-সম্পদের আমানাত। যদি কেউ কারো কাছে কোন ধন-সম্পদ বা জমি জায়গার দলিলপত্র গচ্ছিত রাখে, তাহলে তা ঠিকমত হেফাজত করা এবং তা ব্যবহার না করা (হ্যাঁ যদি দাতা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তবে ব্যবহার করা যাবে।) এবং চাওয়ামাত্র টালবাহানা না করে তা ফেরৎ দেয়া।

(৩) গোপন কথার আমানত। কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলে, তাহলে তা গোপন রাখাই হলো কথার আমানত হেফাজত করা।

যদি কেউ কারো গোপন কথা ফাঁস করে দেয় তার পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি তার অপর কোন ভাইয়ের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও কিয়াতের দিন তার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবেন।"

www.pathagar.com

(৪) মজুর, শ্রমিক এবং চাকুরী জীবিদের জন্য যে সময় এবং কাজ নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয় তা যথাযতভাবে পালন করা তার দায়িত্বের আমানত। এর মধ্যে নিজের কাজ করা এবং সময় দেয়া আমানতের খেয়ানত। কামচুরি এবং সময় চুরি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এ ব্যাপারে তাকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। **মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ**

وَعَبْدُ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ

অর্থাৎ "কোনো লোকের চাকর বা কর্মচারী তার মালিকের সম্পদ এবং দায়-দাযিত্বের রক্ষক এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে) জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

(৫) দায়-দায়িত্বের আমানাত। সাংগঠনিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যার যে দয়িত্ব আছে তা যথাযতভাবে পালন করা তার জন্য আমানাত। প্রতিটি দায়িত্বের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল বলেনঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই (আল্লাহ্র দরবারে) আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র নায়ক যিনি তিনি তার অধিনস্থদের এবং তার দায়-দায়ত্বের রক্ষক। তিনি তার দায়-দায়িত্ব এবং অধিনস্থ নাগরিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।" (বুখারী, মুসলিম)

(৬) সংগঠন বা সমাজের কোন সম্পদের আমানত। যদি কোন নেতার কাছে সংগঠনের বা সমাজের কোনো সম্পদ থাকে সেটা রক্ষণাবেক্ষণকরা তার জন্য বড় ধরনের আমানাত। সুতরাং এই সম্পদের যতেচ্ছা ব্যবহার না করে তা যথাযতভাবে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) গণতান্ত্রিক দেশে ভোটারদের ভোটের বা মতামতের আমানত। এই ভোটের ক্ষমতা যথাযত এবং যথা যায়গায় প্রয়োগ করা ভোটের বা মাতামতের আমানাত। এটা আমরা গুরুত্ব না দিলেও আমরা ভোটের বা মতামতের ক্ষমতা যার পক্ষে প্রয়োগ করলাম সে যদি কল্যাণকর কাজ

www.pathagar.com

করে তবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে। আবার যদি সেই প্রতিনিধি অন্যায় এবং খোদাদ্রোহী কাজ করে তবে তারও অন্যায়ের শাস্তির অংশ ভোগ করতে হবে।

মোট কথা মু'মিনের জন্য প্রতিটি বিষয়ের আমানাত সঠিকভাবে হেফাজত বা সংরক্ষণ করা ঈমানের পরিচয়। যদি কেউ আমানাত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ "তার ঈমান নেই যার মধ্যে আমানাতদারী নেই।" (বায়হাকী)

ষষ্ঠ গুণ ঃ عَهْدٌ ওয়াদা বা অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পালন করা। অঙ্গীকার দু'ধরনের হতে পারে। ঃ

প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অর্থাৎ যে চুক্তির মধ্যে দু'টি পক্ষ থাকে এবং উভয় পক্ষই একটা বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। তবে উভয়েরই সেই চুক্তি পালন করা অপরিহার্য। কেউ এর খেলাপ করলে তা বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণার মধ্যে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গীকার, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কোনো কিছু দেবার বা কোনো কাজ করে দেবার ওয়দা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী এবং অপরিহার্য। হাদীসে আছে– اَلْعِدَةُ الدَّيْنِ অর্থাৎ "ওয়াদা এক প্রকার ঋণ।" ঋণ আদায় করা যেমন অতীব জরুরী তেমনি ওয়াদা পূরণ করাও জরুরী।

তবে যদি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা একতরফা ওয়াদা কোন কারণে পালন করতে সমস্য দেখা দেয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলাপ করে তার সম্মতির ভিত্তিতে রিভিউ করা বা সময় বাড়িয়ে নেয়া ওয়াদা খেলাপের মধ্যে গণ্য হবে না।

আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজে-কামে ওয়াদা করে থাকি, যেমন– পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রীর সাথে একে অপরে ওয়াদা করে থাকি, যাকে আমরা খুবই হালকা করে দেখে থাকি। যদি এই ওয়াদা পূরণ করা না হয়, তাহলে প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে যাবে। তাছাড়া চাকরী-বাকরী, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংগঠনিক এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে ওয়াদা করে থাকি যা পালন করা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। অথচ দেখা যায় প্রতিনিয়ত এরকমের অসংখ্য ওয়াদা করা হচ্ছে এবং তার খেলাফও

www.pathagar.com

করা হচ্ছে। এর মূল কারণ হলো ওয়াদা পালনের যে গুরুত্ব রয়েছে তার সম্পর্কে চেতনা কম। অথচ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা দ্বীনদারীর সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

অর্থাৎ "তার দ্বীনদারী নেই যার ওয়াদা ঠিক নেই।" (বায়হাকী)

সপ্তম গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের নামাযে যত্নবান।" নামাযে যত্নবান হবার অর্থ হলো নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রুহুল মা'আনী)

এখানে صَلٰوٰةْ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে। যেগুলো মোস্তাহাব অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে যথাযতভাবে পাবন্দী সহকারে আদায় করা বোঝায়।

মু'মিনদের গুণাবলীর মধ্যে প্রথমে বলা হয়েছে, তারা নামায বিনয়ের সাথে মনোনিবেশ সহকারে আদায় করে। তাই এখানে صَلٰوٰةْ শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে নামাযের জাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সে নামায ফরয অথবা ওয়াজিব কিম্বা সুন্নত অথবা নফল নামায হোক– নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্রভাবে আদয় করা।

এখানে নামাযসমূহের 'সংরক্ষণ' হলো– নামাযের বাইরের এবং ভিতরের যাবতীয় নিয়ম নীতি যথাযতভাবে পালন করা। যেমন–

* নামাযের পূর্বশর্তগুলো যেমন– শরীর, পোশাক, নামাযের স্থান (জায়নামায) ইত্যাদি পাক-পবিত্র হওয়া।

* সময় মতো মোস্তাহাব ওয়াক্তে, অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া। হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْوَقْتُ الْاَوَّلَ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ

অর্থাৎ "নামায ওয়াক্তের প্রথম সময়ে আদায় করলে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করা যায় এবং শেষ সময় আদায় করলে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়া যায় (অর্থাৎ

www.pathagar.com

শেষ ওয়াক্তে নামায পড়লে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, কেবল গুনাহ্ থেকে বাঁচা যায় মাত্র)।" (তিরমিযী)

✱ মসজিদে জামায়াতের সাথে নাময আদায় করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ অর্থাৎ "জামায়াত ছাড়া নামায কল্পনা করা যায় না।"

✱ শুদ্ধ, ধীর স্থির ভাবে দোআ-কালাম পাঠ করা।

✱ নামাযের রোকন যেমন– রুকু, সিজ্‌দাহ্, কিয়াম এবং বৈঠক ইত্যাদি মনোযোগের সাথে ধীর-স্থিরভাবে আদায় করা।

✱ খুশূ-বিনয়-নম্র এবং মনোনিবেশ সহকারে নামায আদায় করা।

✱ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নামাযের হেফাজত করা। মুয়াত্তা ইমাম মালেকের হাদীসের কিতাবে আছে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সমস্ত গভর্ণরদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে,

اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَافِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعُهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ

অর্থাৎ "তোমাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের মধ্যে নামাযই হলো আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে সাবধানতার সাথে নিজের নামায আদায় করলো এবং (অন্যদের) নামাযের তত্ত্বাবধান করলো সে যেনো তার পূর্ণ দ্বীনের হেফাজাত করলো। আর যে নামাযের খেয়াল রাখলো না তার পক্ষে অন্যান্য দায়িত্ব পালনে খেয়ানত আদৌ অসম্ভব কিছু নয়।"

সর্বপরি নামায হেফাজাত করা না করার মধ্যে আখেরাতের মুক্তির এবং ধ্বংসের কারণ রয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবীর হাদীস। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের হেফাজাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "যে লোক নামায সঠিকভাবে হেফাজাত করবে, তার এ নামায কিয়ামতের দিনে তার জন্যে আলো, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে এবং যে তা সঠিকভাবে হেফাজাত করবে না, তার জন্যে নামায কিয়ামতের দিনে আলো, দলীল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিনে

www.pathagar.com

কারুন, ফেরাউন ও উবাই ইবনে খালফের ন্যায় কাফেরদের সাথে উঠবে। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, মুমিনদের সাতটি গুণ নামায দিয়েই শুরু করা হয়েছে এবং নামায দিয়েই শেষ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, নামায এমন একটি ইবাদাত যা পরিপূর্ণভাবে এবং পাবন্দী ও নিয়ম-নীতির সাথে আদায় করলে অন্যান্য যাবতীয় গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে আল্লাহ্‌র ও বান্দার যাবতীয় হক বা অধিকার এবং এ সম্পর্কিত সব বিধি-বধান প্রবৃষ্ট হয়ে গেছে। যেসব ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে এবং এতে অবিচল অটল থাকবে সে কামেল মুমিন হবে এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার হয়ে যাবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারীশ বা উত্তরাধীকারীর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এখানে এজন্য উত্তরাধীকারী বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকরীদের জন্য প্রাপ্য ও অনিবার্য হয়ে যায় তেমনি এসব গুণের অধিকারী মুমিন ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা এখানে জান্নাতের কথা বলতে গিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা বলেছেন। জান্নাতের যে আটটি স্তর রয়েছে তার মধ্যে সর্বউত্তম স্তর হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। যেহেতু মুমিনদের এই সাতটি গুণ বিশেষ গুণ সে কারণে তাদের জন্য বিশেষ জান্নাত "ফেরদাউসের" ওয়াদা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্য এবং তার উম্মতদেরকে জান্নাত কামনার জন্য উত্তম জান্নাত চাওয়ার বাণী শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি।"

www.pathagar.com

শিক্ষা ঃ সূরা মু'মিনুনের প্রথম ১১টি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলোঃ

* ঈমানদার হবার জন্য ঈমানের যেসব শর্ত রয়েছে তা যথাযতভাবে মানতে হবে। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে।

* যে নামাযই হোক না কেনো তা আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জেনে খুশূ-খুজু ও মনোযোগের সাথে ধীর-স্থিরভাবে আদায় করতে হবে।

* আজে-বাজে এবং অকল্যাণকর কথা, কাজ এবং চিন্তা থেকে দূরে থেকে কল্যাণকর এবং আখেরাতমুখী কথা, কাজ, ও চিন্তা করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে।

* ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও ধন-সম্পদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে।

* অবৈধ পথে যৌনক্ষুধা না মিটিয়ে বৈধ স্ত্রীর সাথে বৈধ পথে যৌন চাহিদা মিটাতে হবে। তবে একে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানানো যাবে না। তাছাড়া যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজে বা পরিবেশে নিজেকে জড়ানো যাবে না। বেহায়াপনা ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। জেনার যে মূল দরজা পর্দা, তা ঠিকমত মেনে চলতে হবে।

* আল্লাহর পক্ষ থেকে হোক আর মানুষের পক্ষ থেকে হোক আমানত সমূহ যথাযতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

* দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হোক আর একপক্ষ থেকে ওয়াদা হোক তা যথাযতভাবে মেনে চলতে হবে এবং ওয়াদা ও চুক্তি মতো আদায় করতে হবে।

* পাঁচ ওয়াক্ত নামায হেফাজতের জন্য নিজে যথাযতভাবে যথা সময়ে জামায়াতের সাথে মনোনিবেশ সহকারে নামায আদায় করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

* সর্বপরি উপরোক্ত আমলগুলো বিশুদ্ধ নিয়্যাত এবং নিষ্টার সাথে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে রাজী-খুশী করে জান্নাতুল ফেরদাউস পাবার আশায়

www.pathagar.com

করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে যাতে করে মনের মধ্যে কোনোভাবেই রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব সৃষ্টি না হয়।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা আমি আপনাদের সামনে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সূরা আল-মু'মিনুনের ১-১১ নং আয়াতের যে দারস পেশ করলাম, এতে আমার অজান্তে যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আজকের এই দারসে মুমিনদের যেসব গুণের কথা জানতে পারলাম তা যেনো আল্লাহ পাক আমাদের জীবনে পালনের তৌফিক দেন। আর এরই বিনিময়ে আমাদরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। [দারস শেষ করার সময় এভাবে আহ্বান জানিয়ে সালাম দিয়ে শেষ করবেন।]

www.pathagar.com

তিন

বাড়িতে ঢোকার শিষ্টাচার

সূরা নূর- ২৭-২৯ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজের বাড়ি ছাড়া অন্যদের বাড়ীতে ঢোকে পড়ো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও অথবা আলাপ পরিচয় না করো এবং বাড়ির লোকজনকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম (পথ), যাতে তোমরা স্মরণ রাখো বা উপদেশ গ্রহণ করো। (২৮) তবে যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে ঢোকে পড়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে (ঢোকার) অনুমতি না দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে (ভিতর থেকে) বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে এবং তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (২৯) তোমাদের জন্য কোন দোষ বা

www.pathagar.com

পাপ হবে না যদি তোমরা এমন বাড়ীতে ঢোকো, যে বাড়ীতে কেউ বসবাস করে না, যাতে তোমাদের জরুরী এবং প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র আছে। আর আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اَمَنُوْا - তোমরা ঈমান এনেছো। لَا تَدْخُلُوْا - তোমরা প্রবেশ করো না। بُيُوْتًا - বাড়িগুলোতে। غَيْرَ - অন্য, অপর, ছাড়া। بُيُوْتِكُمْ - তোমাদের বাড়িসমূহ। حَتّٰى - যতক্ষণ পর্যন্ত। تَسْتَاْنِسُوْا - তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো। تُسَلِّمُوْا - তোমরা সালাম করবে। عَلٰى - উপর। اَهْلِهَا - তার অধিবাসী। ذٰلِكُمْ - এটা তোমাদের জন্য। خَيْر - উত্তম। لَعَلَّكُمْ - যাতে তোমরা। تَذَكَّرُوْنَ - তোমরা স্মরণ রাখবে বা উপদেশ গ্রহণ করবে। فَاِنْ - অতঃপর যদি। لَمْ تَجِدُوْا - তোমরা না পাও। فِيْهَا - উহাতে। اَحَدًا - কাউকে। فَلَا تَدْخُلُوْهَا - তাতে প্রবেশ করবে না। يُؤْذَنَ - অনুমতি দেয়া হয়। لَكُمْ - তোমাদের জন্য। اِنْ - যদি। قِيْلَ لَكُمْ - যদি তোমাদেরকে বলা হয়। اِرْجِعُوْا - তোমরা ফিরে যাও। هُوَ - এটা। اَزْكٰى - অতি পবিত্র, বিশুদ্ধতম। تَعْمَلُوْنَ - তোমরা কাজ করো। عَلِيْمٌ - জানেন, অবগত আছেন। لَيْسَ - নেই। عَلَيْكُمْ - তোমাদের উপর। جُنَاحٌ - পাপ, দোষ, গুনাহ। غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ - যে ঘরে কেউ বসবাস করে না, বসতিহীন। مَتَاعٌ - দ্রব্য সামগ্রী। تُبْدُوْنَ - তোমরা প্রকাশ করো। تَكْتُمُوْنَ - তোমরা গোপন করো।

সম্বোধন ঃ উপস্থিত সম্মানিত ইসলামপ্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা। আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে দারসে কুরআন পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা নূর এর ২৭ থেকে ২৯ নং পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত এবং তরজমা করেছি। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যেনো আমাকে সঠিকভাবে এবং

www.pathagar.com

সহীহ্ সালামতে শেষ পর্যন্ত দারসে কুরআন পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন। অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্। [উপস্থিত শ্রোতাদের এভাবে সম্বোধন করবেন]

সূরার নামকরণ ঃ সুরা আন-নূরের নামকরণ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ এই সূরার ৫ম রুকুর ২৫ নং আয়াত– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর নূর।" এখানে উল্লেখিত نُوْرٌ শব্দটি থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর মানে এই যে, এটা সে সূরা যাতে نُوْرٌ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। নূর মানে জ্যোতি বা আলো। 'নূর' এমন জিনিসকে বুঝায় যার সাহায্যে জিনিসগুলো প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ যা নিজেই প্রকাশ হয় এবং অন্যান্য জিনিসকেও আলোকিত করে। অপর দিকে কিছু বুঝতে না পারার অবস্থাকে বলা হয় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, আলোবিহীন। ইসলাম আসার আগে "আইয়্যামে জাহেলিয়াত" বা 'অন্ধকার যুগে' সমাজে যেসব কাজ-কাম হতো সেগুলো সমাজকে অন্ধকার ও কুসংস্কারে ঘিরে রেখেছিলো। সূরা নূরে সেসব অসামাজিক কাজ-কামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেছে। জাহেলী যুগের অন্ধকার সমাজকে সভ্যতা ও আলোর মুখ দেখিয়েছে সূরা নূরের কঠোর বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন। সুতরাং বলা যায় যে এই সূরার বিষয়ের সাথে নামের বেশ মিল রয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ সর্ব সম্মত মতে সূরাটি মাদানী। এই সূরাটি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হবার পর নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে সবাই একমত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে মহানবী (সাঃ) কাফের বনী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়েছিলেন। উক্ত অভিযান হতে ফিরে আসার একমাস পরই এ সূরার কিছু অংশ নাযিল হয়। অবশ্য কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে নাযিল হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের মতে সূরা নূরের সমস্ত অংশই পঞ্চম হিজরীতে নাযিল হয়েছে বলে এক মত পোষণ করেন। (তাফসীরে বাহরুল মুহীত)

তবে পঞ্চম হিজরী হোক আর ষষ্ঠ হিজরী হোক না কেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাদানী জীবনের মাঝামাঝি সময় সূরাটি নাযিল হয়।

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু ঃ সূরা নূরে পর্দার চূড়ান্ত বিধানসহ সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের জন্য অনেকগুলো হেদায়েত এবং সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন নাযিল করা হয়েছে। কেননা স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাপ-মা, ভাই-বোন ও চাকর চাকরানী ইত্যাদি এক অন্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরিবার। আর পরিবার হচ্ছে সমাজেরই ভিত্তি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। আর সমাজ জীবনের সুষ্ঠতা ও সুস্থতা নির্ভর করে সুন্দর এবং সুষ্ঠু সামাজিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের উপর। আল্লাহ পাক সূরা নূরের প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিদান লিখে দিয়েছেন যাতে করে সমাজে কোন প্রকার খারাবী সৃষ্টি হলে এর প্রতিরোধ করা যায় এবং দূর করা যায়। আর সূরার শেষের দিকে এমন সব নিয়ম-কানুন ও উপদেশ দিয়েছেন যার মাধ্যমে সমাজে দোষ-ক্রটি ও পাপের সব পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সূরা নূরে যেসব সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি সমূহ রয়েছে তা হলো–

(১) ব্যভিচারের শাস্তির বিধান, (২) ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সংক্রান্ত আইন, (৩) মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান, (৪) স্বামী-স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত 'লিআনের' বিধান, (৫) ভিত্তিহীন এবং ওড়ো খবর প্রচারকারীর শাস্তির বিধান, (৬) অপরের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম-নীতি, (৭) পুরুষ-নারী উভয়ের চোখের নযরের সংযম এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতের বিধি-বিধান, (৮) মেয়ে লোকদের সৌন্দর্য প্রকাশের বেলায় পর্দা সম্পর্কে বিধান, (৯) অবিবাহীত নারী-পুরুষের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিধান। (১০) দাস-দাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান, (১১) বেশ্যাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন-কানুন, (১২) পারিবারিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, (১৩) বৃদ্ধা নারীদের পর্দার বিধান, (১৪) মেহমানদারী ও ইসলামের উদারতা সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, (১৫) সামাজিক কাজে অংশ নেয়া এবং বিনা অনুমতিতে বিরত না থাকার নিয়ম-নীতি এবং (১৬) ভদ্রোভাবে একে অপরকে আহবান বা ডাকা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সূরা নূরের বর্ণিত সামাজিক বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতিসমূহ নাযিল করার মূল উদ্দেশ্যই হলো মুসলিম সমাজকে সব

www.pathagar.com

রকমের খারাবী সৃষ্টির বিস্তার লাভ হতে রক্ষা করা। আর যদি কোন ঘটনা ঘটেও যায় তবে তাড়াতাড়ি তা রোধ করা।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ

দারসের আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু হলো একে অপরের ঘর বা বাড়ীতে ঢোকার নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান।

শানে নুযূল ঃ অত্র আয়াত অবতরণের উপলক্ষ ছিলো এই যে, একজন আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বাড়ীতে কোনো কোনো সময় এমনভাবে থাকি যে, সে অবস্থায় কেউ আমাকে দেখতে পাক আমি তা চাই না। কিন্তু আমার লোকজনের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা অনুমতিতে আমার ঘরে ঢোকে পড়ে। এখন আমি কি করবো? তখন মহিলাদের পর্দা রক্ষার জন্য এই সূরার ২৭ নং আয়তটি নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি নাও এবং বাড়ীওয়ালাদের প্রতি সালাম করো।"

আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে অপরের ঘরে বা বাড়ীতে অনুমতি না নিয়ে ঢোকতে মানা করে দেয়ার মাধ্যমে বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি নেয়ার বেশ কিছু নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা অনুমতি চাওয়ার পেছনে বেশ কিছু রহস্য এবং উপকারিতা রয়েছে।

আল কুরআনের আলোকে সামাজিকতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-নীতি হলো কারো সাথে দেখা করতে গেলে প্রথমে অনুমতি নেয়া এবং অনুমতি ছাড়া ঘরে বা বাড়ীতে না ঢোকা। আল্লাহ পাক সকল মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা নিজের বাড়ি হোক অথবা ভাড়া বাড়ি হোক। সকল অবস্থায় তার ঘরই হলো আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য হলো শান্তি ও আরাম-বিরাম। এ সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, جَعَلَ لَكُمْ

مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا "আল্লাহ তোমাদের বাড়ি তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের জায়গা করেছেন।" এ শান্তি ও আরাম তখনই ঠিক থাকতে পারে যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজ বাড়ীতে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ-কাম ও বিশ্রাম নিতে পারে। তার স্বাধীনতার উপর বাধা সৃষ্টি করা ঘরের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকেও অহেতুক কষ্ট দেয়া হারাম করেছে। আর এ অনুমতি নেয়ার মধ্যে বেশ উপকারিতাও রয়েছে। যেমন–

প্রথম উপকার ঃ অনুমতি চাওয়া বিধানের মধ্যে প্রথম উপকার হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি ও কষ্ট দেয়া হতে আত্মরক্ষা করা, যা প্রতিটি সম্মানি মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে।

দ্বিতীয় উপকার ঃ সাক্ষাৎ প্রার্থী ব্যক্তি যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রভাবে দেখা করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য খেয়াল করে শুনবে। তার কোনো অভাব বা প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করার উৎসাহ তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্র ভাবে কোন ব্যক্তির উপর বিনা অনুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে হঠাৎ বিপদ মনে করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং সহানুভূতির প্রেরণা থাকলে তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকার ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কেননা অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকলে গায়ের মোহরেম (যার সাথে বিবাহ করা জায়েজ) এমন মেয়ে লোকের উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো কুভাব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি নেয়ার বিধানগুলোকে আল্লাহ পাক জেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা তহমত প্রভৃতির শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকার ঃ মানুষ মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে নিরিবিলি অবস্থায় এমন কাজ করে, যা অপরকে জানানো পছন্দ করে না। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া ঘরে ঢোকে তা হলে ভিন্ন লোকজন তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জেনে ফেলে। কারো গোপন ব্যাপার জবরদস্তি করে জানার চেষ্টা করাও গুনাহ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারণ।

www.pathagar.com

তাই আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং আখেরাতের অগণিত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে পরের বাড়ীতে ঢোকার নিয়ম-নীতি এবং বিধি-বিধান অত্র আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিয়েছেন।

একে অপরের ঘর বা বাড়ীতে ঢোকার নিয়ম-নীতিগুলো নীচে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

একঃ আয়াতে يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "হে মুমিনগণ" বলে পুরুষ লোকদের সম্বোধন করা হলেও মেয়ে লোকেরাও এই বিধানের মধ্যে শামিল। সাহাবীদের স্ত্রীরা এ আয়াতের আলোকে অনুমতি নেয়ার বিধান মেনে চলতেন।

হযরত উম্মে আয়াস (রাঃ) বলেন, আমরা চারজন মেয়েলোক প্রায়ই হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে যেতাম। আমরা প্রথমে তাঁর অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে ঢোকতাম।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্য কারো ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার আগে নারী-পুরুষ, মুহরিম (যার সাথে বিবাহ হারাম) ও গায়ের মুহরিম (যার সাথে বিবাহ জায়েজ) সকলেরই অনুমতি নিতে হবে। আর এ নিয়মটি সবার জন্যই মঙ্গলজনক।

حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

দুই ঃ অর্থাৎ "যতক্ষণ তোমরা ঢোকার অনুমতি না নাও এবং ঘরের বা বাড়ির লোকজনকে সালাম দাও।"

এখানে অনুমতি নেবার জন্য দু'টি কাজের কথা বলা হয়েছে। এ দু'টি কাজ না করে কারও ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকা ঠিক নয়।

(ক) কাজ দুটির মধ্যে প্রথমটি হলোঃ প্রীতি বিনিময় করা বা পরিচিত হওয়া বা অনুমতি নেয়া। ঘরবাড়ীতে ঢোকার আগে অনুমতি নিলে বা পরিচয় হলে ভিতরের লোকজন সতর্ক হতে পারে। আগন্তুকের সাথে ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয় এবং আগমনকারীর ব্যাপারে আতংক বা ভয় কেটে যায়।

(খ) দ্বিতীয় কাজ হলো ঃ ঘরের বা বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়া।

অনুমতি আগে না সালাম আগে এ বিষয়ে কিছু মতামত আছে তা হলো ঃ

www.pathagar.com

ইমাম কুরতুবীর মতে প্রথমে অনুমতি নিয়ে তার পর ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার সময় সালাম দেবে।

মাওয়ারদী বলেন, যদি অনুমতি নেবার আগেই বাড়ির কোনো লোকজনের সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সালাম দেবে, এরপর অনুমতি চাইবে। দেখা না হলে প্রথমে অনুমতি চাইবে। অনুমতি পাওয়া গেলে পরে ঢোকার সময় সালাম দেবে।

কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, বাইরে থেকে প্রথমে সালাম দিতে হবে। তারপর নিজের নাম পদবী থাকলে পদবীসহ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলবে যে, অমুক দেখা করতে চায়।

অনুমতি নেবার সুন্নত তরীকা ঃ

ইবনে জরীর এবং আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো। বলতে লাগলো– أَ أَلِجُ "আমি ভিতরে আসবো কি?" নবী (সাঃ) তাঁর খাদেমকে বললেন ঃ লোকটি অনুমতি নেবার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَ أَدْخُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? খাদেম বাইরে যাবার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা শুনে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَ أَدْخُلُ বললো। অতঃপর তিনি তাকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন। (ইবনে কাসীর)

আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে– "কালাদা ইবনে হুম্বল নামক এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে কোনো কাজের জন্য এসে সালাম না দিয়েই বসে পড়লো। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ "বাইরে যাও এবং আসসালামু আলাইকুম বলে ভিতরে আসো।"

বায়হাকী হযরত জাবের (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন– لَا تَأْذَنْ لِمَنْ لَا يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ "যে প্রথমে সালাম করে না তাকে ভিতরে ঢোকতে অনুমতি দিও না।" (মাযহারী)

ইমাম বোখারী আদাবুল মুফরাদ কিতাবে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)

www.pathagar.com

থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আগে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ, সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করেছে। (রুহুল মা'আনী)

মোট কথা এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে যে সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি পাবার জন্যে বাইরে থেকে এ সালাম করা হয়, যাতে ঘরের ভেতরের লোকজন এদিকে খেয়াল করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার সময় যথারীতি আবার সালাম করতে হবে।

তিন. নিজের নাম উচ্চারণ করে অনুমতি চাওয়া ঃ অনুমতি চাওয়ার সময় অথবা ভিতর থেকে নাম জানতে চাইলে নিজের নাম স্পষ্টভাবে বলতে হবে। আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে; হযরত উমর (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হতেন তখন বলতেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَدْخُلُ عُمَرَ۔ অর্থাৎ "সালামের পর বললেন, উমর ঢোকতে পারে কি?"

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবু মূসা হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে গিয়ে অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُوْ مُوْسٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الاَشْعَرِىُّ

এখানে তিনি সালাম দেয়ার পর প্রথমে নিজের নাম আবু মূসা বলেছেন, এরপর আরো নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রর্থীকে না চেনা পর্যন্ত নির্ভিগ্নে জবাব দেয়া যায় না।

চারঃ দরজার কড়া নেড়ে বা কলিং বেল টিপে নিজের নাম বলাঃ দরজার কড়া নেড়ে বা কলিং বেল বাজিয়ে অনুমতি চাওয়া যাবে। তবে কড়া এতো জোরে নাড়া উচিৎ নয়, যাতে ঘরের লোকজন চমকে উঠে। কড়া নাড়া বা কলিং বেল বাজানোর সময় নিজের নাম বলতে হবে। অথবা ভিতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে আমি আমি না বলে নিজের নাম বলতে হবে। আবু দাউদ শরীফের হাদীসে রয়েছে– "হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি আমার মরহুম আব্বার ঋণ সম্পর্কে কথা বলার জন্য নবীজির দরবারে গিয়েছিলাম। আমি দরজার কড়া নেড়ে খট খট শব্দ করলে তিনি ভিতর থেকে জানতে চাইলেন– কে? তখন আমি

www.pathagar.com

বললাম, 'আমি'। এতে রাসূল (সাঃ) দুই তিনবার বললেনঃ 'আমি' 'আমি' 'আমি' বললে কি পরিচয় বোঝা যাবে? এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, পরিচয় জানতে চাইলে স্পষ্টভাবে নিজের নাম না বলা বা চুপচাপ থাকা বা 'আমি' 'আমি' বলা ঠিক নয়।

পাঁচ ঃ অনুমতি নিতে গিয়ে ঘরের ভিতর তাকানো বা উঁকি ঝুঁকি মারা যাবে না ঃ নবী করীম (সাঃ) এর নিজের নিয়ম ছিলোঃ "যখন তিনি কারো কাছে যেতেন, তখন দরজার সামনে দাঁড়াতেন না। কেননা সেকালে দরজায় পর্দা ঝুলানো হতো না। তিনি দরজার ডানে অথবা বামে সরে দাঁড়িয়ে ঢোকার অনুমতি চাইতেন।" (আবু দাউদ)। রাসূল (সাঃ) এর খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর হুজরার বাহির হতে তাকালো। তখন নবী করীম (সাঃ) এর একটি তীর ছিলো। তিনি সেই লোকটির দিকে এমনভাবে আগিয়ে গেলেন যে, মনে হচ্ছিলো তিনি তিরটি লোকটির পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) অন্য হাদীসে আছে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ مَنِ اطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنَهُ - "যে কেউ অন্যের ঘরে উঁকি মারবে, যদি ঘরের লোকেরা তার চোখ ফুটা করে দেয়, তবে সেই জন্য তার কোনো দোষ হবে না।"

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহ্বীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর দরজার উপর দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ সরে দাঁড়াও, অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ তো এজন্য যে ভিতরে যেনো চোখ না পড়ে।"

ছয় ঃ ফিকাহ্বিদদের মতে ঘরের ভিতর নযর দেয়ার মতো ঘরের মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে কারো গোপন কথা শুনাও অবৈধ। এজন্য অন্ধ লোককেও ঘরে অনুমতি নিয়ে ঢোকতে হবে। কারণ সে চোখে না দেখলেও কানে গোপন কথা শুনতে পাবে।

সাত ঃ অনুমতি ছাড়া কারো চিঠি পড়াও অবৈধ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِىْ

النَّارِ (ابو داؤد)

"যে লোক তার কোন ভাইয়ের চিঠি তার অনুমতি না নিয়ে পড়লো, সে যেনো ঠিক জাহান্নামের দিকে তাকালো।"

আট ঃ আপন মা, বোন ও স্ত্রীর ঘরে ঢোকতেও অনুমতি নিতে হবে ঃ ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, নিজের মায়ের নিকট যেতেও কি আমি অনুমতি চাইবো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তো তার খেদমতের জন্য আর কেউ নেই, এখন কি আমি প্রত্যেক বারই অনুমতি চাইবো? তখন রাসূল (সাঃ) বললেনঃ اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً

"তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে?"

অপর এক হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْ تَسْتَاْذِنُوْا عَلٰى اُمَّهَاتِكُمْ وَاَخَوَاتِكُمْ

"তোমরা তোমাদের মা-বোনদের নিকট যেতে হলেও অনুমতি নিয়ে যাবে।" (ইবনে কাসীর)

নয় ঃ কারও ঘরে বা বাড়ীতে হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দিলে তখন অনুমতি নেবার এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যেমন আগুন লাগলে, চোর ঢোকে পড়লে বা হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহায্য করার জন্য অনুমতি না নিয়ে ঘরে বা বাড়িতে ঢোকে পড়া যাবে।

দশ ঃ অনুমতি হয় বাড়ির মালিক নিজে দেবে, নতুবা এমন ব্যক্তি দেবে, যার অনুমতিকে বাড়ির মালিকের অনুমতি মনে করা যেতে পারে। কোনো শিশু যদি বলে, 'ঘরে আসো' তবে তার এই ডাকের উপর নির্ভর করে ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না।

এগার ঃ অনুমতি চাওয়ায় অকারণ বাড়াবাড়ি কিংবা অনুমতি না পেলে দুয়ারে বা গেটে ধর্ণা দিয়ে থাকা যাবে না। তিনবার সালামের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়ার পরও যদি বাড়িওয়ালার কোনো উত্তর পাওয়া না যায়, বা সে দেখা দিতে অস্বীকার করে তবে মনে কষ্ট না নিয়ে ফিরে চলে যাওয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ

অর্থাৎ "সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে ঢোকবে না যতক্ষণ না তোমাকে অনুমতি দেয়া হবে।"

বার ঃ এই আয়াতে বোঝা যায় কারও শুণ্য বা খালি ঘরে ঢোকা যাবে না। অবশ্য যদি ঘরের মলিক কাউকে পূর্বে অনুমতি দিয়ে থাকে, তবে অন্য কথা। যেমন যদি আগেই বলে দেয় যে, আমি না থাকলে আপনি কামরায় বসবেন। কিংবা সে যদি অন্য যায়গা থেকে আগন্তুকের আগমনের খবর শুনে বলে যে, আপনি বসুন, আমি আসছি। নতুবা ঘরে কেউ নেই কিংবা ভিতর থেকেও কেউ উত্তর না দেয়, তাহলে ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকা যাবে না।

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا

"যদি তোমাকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে।"

তের ঃ অনুমতি না পেয়ে ফিরে যাওয়াকে খারাপ মনে করা ঠিক হবে না। কারও কাছে ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি বলা হয়, এখন ফিরে যান, পরে দেখা করুন, তবে এতে মনে কষ্ট না নিয়ে খূশী মনে ফিরে আসা উচিৎ।

অনুমতি প্রার্থীর প্রতি এ আদেশ দেয়া হয়েছে ঘরের মালিকের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রেখে। কেননা তার বিশেষ কোনো ওজর থাকতে পারে। অপরদিকে হাদীসে বাড়ির মালিককে বলা হয়েছে যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও তোমার উপর হক রয়েছে। তার হক হচ্ছ- তাকে কাছে ডাকা, বাইরে এসে তার সাথে দেখা করা, তার কথা শুনা, তাকে ঘরে বসতে দেয়া, তার খায়-খাতির করা, ক্ষমতা অনুযায়ী মেহমানদারী করা। একান্ত অসুবিধা না থাকলে তাকে ফিরিয়ে না দেয়া।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝

অর্থাৎ "তোমাদের জন্যে সেই সব ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা দোষের নয়, যেটা কারো বসবাসের জায়গা নয়, অথবা সেখানে তোমাদের

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় ব্যবহারের কোনো জিনিস-পত্র আছে। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো।”

শানে নযূল ঃ যখন বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে বা বাড়ীতে না ঢোকার বিধানের আয়াত নাযিল হলো, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ নিষেধাজ্ঞার পর কুরাইশদের ব্যবসায়ী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা হতে সুদূর শাম দেশ পর্যন্ত তারা ব্যাবসা-বানিজ্যের জন্য সফর করে। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে যেসব সরাইখানা আছে, তারা ওগুলোতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে, যেখানে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা থকে না, এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছে থেকেই বা অনুমতি নিতে হবে? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। (তাফসীরে মাযহারী)।

অর্থাৎ এমন ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকতে কোনো বাধা নেই; যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বসবাসের ঘর নয় বরং সেটাকে ব্যবহার ও সেখানে থাকার অধিকার সবার আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও নগরের আসপাশে নির্মিত মুসাফিরখানা, মসজিদ, খানকাহ্ মাদ্রাসা, পাঠাগার, হাসপাতাল, রেল ষ্টেশন, হোটেল, রেস্তোরা, সরাইখানা প্রভৃতি জনকল্যাণকর ঘর বা প্রতিষ্ঠানে বিনা অনুমতিতে সকলেই ঢোকতে পারে। তবে এসব ঘরের বা প্রতিষ্ঠানের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের দেয়া নিয়ম-নীতি অমান্য করা ঠিক হবে না।

পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমরা যা কিছু করো এবং যে উদ্দেশ্যেই করো তোমাদের বাইরের এবং মনের সব খবর আমি রাখি। আখেরাতেও আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল এবং নিয়্যাত দেখেই চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

শিক্ষা ঃ সূরা নূরের ২৭-২৯ এ তিনটি আয়াত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর একে অপরের বাড়ীতে ঢোকার যেসব বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতিগুলো জানতে পারলাম তা পুরুষ-মহিলা সকলকেই পর্দা রক্ষার জন্য এবং শালিনতা, ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রত্যেককেই বাস্তব জীবনে আমল করা উচিত। তা নিজের বাসা-বাড়ীতে হোক অথবা অন্যের বাসা বাড়ীতে হোক না কেনো।

www.pathagar.com

আহ্বান ঃ উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পর্দা রক্ষার জন্য এবং সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য সূরা নূর থেকে যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে যায়, তাহলে মহান আল্লাহ্র কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ দরস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা আমাদের ইহকালীন কল্যাণ এবং আখেরাতের মুক্তির জন্য বাস্তব জীবনে আমল করি আল্লাহ্ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন। আমিন! অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। [দারস শেষে এভাবে আহ্বান জানাতে হবে।]

www.pathagar.com

চার

ধ্বংস বা ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়

সূরা আল আসর

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১) কালের শপথ, (২) নিশ্চয় (সকল) মানুষই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, (৩) কিন্তু তারা বাদে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে হকের নির্দেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয়।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ – এখানে কসম বা শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। الْعَصْرِ – সময় বা কাল বা যুগ। اِنَّ – নিশ্চয়। اِنْسَانَ – মানুষ। لَ – অবশ্যই। فِيْ – মধ্যে। خُسْرٍ – ক্ষতি বা ধ্বংস। اِلَّا – ছাড়া। اَلَّذِيْنَ – যারা। / – ঈমানদার। اٰمَنُوْا – এবং। وَ – এবং عَمِلُوْا – তারা আমল করে। الصّٰلِحٰتِ – সৎ কর্মশীলা (স্ত্রী লিঃ) و – এবং। وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ – পরস্পর নির্দেশ বা তাগিদ দেয় সত্যের। وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ – পরস্পর তাগীদ বা পরামর্শ দেয় সবরের।

সম্বোধন ঃ প্রিয় ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ দ্বীনদার মুসলমান ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা। আস্‌সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহি অয়া

www.pathagar.com

বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে আল-কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা "আল আসর" তিলাওয়াত এবং তরজমা করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে সহিহ্ সালামতে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। "অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ اَلْعَصْر কেই এর নাম হিসেবে নেয়া হয়েছে। যার মানে- সময়, যুগ বা কাল। সূরাটিতে মানুষকে মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যেসব কাজ করার কথা বলা হয়েছে তা সময় বা কালের সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। বিধায় কুরআন মজিদের ছোট্ট এই সূরাটির বিষয়ের সাথে নামের বেশ সম্পর্ক রয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল প্রমুখ এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারক একে মাক্কী সূরা বলেছেন। সূরাটির বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল করলে বোঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরা। কেননা এ সময় খুবই ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়স্পর্শী বাক্যে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ এবং শিক্ষা পেশ করা হতো। কেউ একবার শুনলে তা আর ভুলতো না। আর সেসবগুলো লোকজনের মুখে মুখে সবসময় লেগে থাকতো এবং অতি সহজেই পাঠ করা হতো। এই সূরাটিও ঠিক সেই সব গুণ নিয়ে নাযিল হয়। কাজেই এটা যে মাক্কী এবং প্রথম দিকের সূরা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু ঃ এ সূরাটি ছোট্ট ছোট্ট আয়াত বা বাক্যের মাধ্যমে অল্প কথায় কোন্ পথে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ এবং মুক্তি আছে আর কোন্ পথে ধ্বংস এবং বিপর্যয় রয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

সূরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সাহাবাদের কাছে সূরাটির মর্ম এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, এ ব্যাপারে হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে হিস্ন (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কোনো দু'জন সাহাবীর যখন একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হতো তখন তারা একে অপরে সূরা আসর পাঠ না করে বিদায় হতেন না। (তাবারানী) সূরাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ "যদি মানুষ

www.pathagar.com

কেবলমাত্র এ সূরাটির মর্ম গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতো, তবে এটাই তাদের হেদায়েত এবং মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতো।" (ইবনে কাসীর)

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা আলোচ্য সূরাটি তেলাওয়াত ও তরজমাসহ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধারণা দেবার পর এখন আপনাদের সামনে সূরাটির বিশেষ বিশেষ শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরাটিতে কালের বা সময়ের শপথ করে বলা হয়েছে, নিশ্চয় সকল মানুষই ক্ষতি বা ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। তবে যাদের মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে কেবলমাত্র তারাই (ক্ষতি থেকে) রক্ষা পেতে পারো। সে চারটি গুণ হলো- (ক) ঈমান (খ) সৎ কাজ (গ) একে অপরকে হকের নসীহত করা এবং (ঘ) পরস্পরকে সবুর করার জন্য উপদেশ দেয়া। আল্লাহ তাআলার এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে যে ব্যাপক তাৎপর্য এবং ভাব রয়েছে তা জানার জন্য এগুলোর প্রত্যেকটির আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

وَالْعَصْرِ "অল আস্‌র" শব্দটির প্রথম অক্ষর و (অয়াও) শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। একে "অয়াও-এ-কাস্‌মিয়া" বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে তাঁরই কোনো সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা কোনো জিনিসের শপথ করলে সেই জিনিসটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য করেন না। বরং তিনি যে কথাটি বলতে চান সেই জিনিস তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তিনি তার শপথ করেন। সুতরাং এখানে 'কালের' নামে শপথ করার অর্থ হলো এই সূরায় যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে যাদের মধ্যে এই চারটি গুণ আছে সে সব লোক ছাড়া বাকি সবাই যে মহাক্ষতি ও ধ্বংসের মুখোমুখি- কাল, সময় ও স্রোত তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

اَلْعَصْرِ। 'আল আসর'- সময় বা কাল বা যুগকে বুঝায়। এটা অতীত কালকেও বুঝায় আবার বর্তমান কালকেও বুঝায়। এতে বর্তমান বলে কোনো দীর্ঘ সময় নয়। প্রতিটি মুহূর্তই সাইকেলের চাকার মতো ঘূর্ণায়নমান। প্রতিটি ভবিষ্যত মুহূর্তকে বর্তমান এবং বর্তমানকে অতীত বানিয়ে দিচ্ছে। এখানে কালের শপথের মধ্যে উভয় কালকেই বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

চলমান সময় ও স্রোতের শপথ করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার জন্য প্রথমতঃ যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হলো এই যে, কালের যে অংশটা এখন চলছে তা আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সময় বা সুযোগ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়। সে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগায়। ফলে সে ভাল ফলাফলের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় প্রতিটি মানুসের হায়াত বা আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই নির্ধারিত আয়ুষ্কালের মধ্যেই মানুষ যদি পরীক্ষার্থীর মতো প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর এবং সঠিক পথে কাজে লাগায় তাহলে সেও সফলতার মাধ্যমে আখেরাতের মহাক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে। সুতরাং মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে ভালো কাজ করতে হবে তা বেঁধে দেয়া আয়ুষ্কালের মধ্যেই করতে হবে। এতে বুঝা যায় যে, সময়ই হলো আমাদের জীবনের আসল মূলধন। অথচ এটা দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ইমাম রাযী (রঃ) এ বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে একজন মনীষীর উক্তি উল্লেখ করেছেন; উক্তিটি হলো এই "একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সূরা আল আসর এর অর্থ বুঝতে পারছি। যেমন বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলছেঃ দয়া করো এই ব্যক্তির উপর যার মূলধন গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনুগ্রহ করো সেই ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির চিৎকার শুনে আমি বললামঃ অল-আসরে ইন্নাল ইনসানা লা-ফী খুসরীন-এর এটাই তো অর্থ।" ফলে মানুষকে যতটা আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে, তা বরফ গলার মতো অতি দ্রুত গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাকে যদি অপচয় কিংবা ভুল ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা হয়, তা হলে বুঝতে হবে, এটাই হলো মানুষের ক্ষতি-এটা ছাড়া মানুষের বড় ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং চলমান কাল স্রোতের শপত করে এই সূরায় যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ্য দেয় এ চারটি গুণ হারিয়ে মানুষ যে সব কাজ করে নিজের আয়ুষ্কাল ক্ষয় করছে তা সবই ক্ষতির কারণ। এ ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র এ সব লোকেরাই রক্ষা পাবে যারা এ চারটি কাজ করবে।

www.pathagar.com

اَلْاِنْسَانُ 'আল ইনসান' শব্দটি একবচন। কিন্তু পরবর্তী বাক্য কয়টিতে চারটি গুণধারী লোকদেরকে তা হতে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, এখানে 'ইনসান' শব্দটি গোটা মানব জাতিকে বুঝাচ্ছে।

خُسْرٍ 'খুসরিন'- খাসারা (ক্ষতি) 'মুনাফা' (লাভ) এর বিপরীত অর্থে বুঝায়। কুরআন মজিদে এ শব্দটিকে একটা পরিভাষা হিসেবে নেয়া হয়েছে এবং فَلَاحْ কল্যাণের বিপরীত অর্থ বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে।

কুরআনের এ فَلَاحْ বা কল্যাণ বলতে কেবলমাত্র বৈষয়িক কল্যাণ-ই বুঝায় না, বরং দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত সাফল্য বুঝাবার জন্যই ব্যবহার করে। তেমনিভাবে خُسْرٍ বা ক্ষতি শব্দটি কুরআনে বৈষয়িক ব্যর্থতা, দুরবস্থা ও বিপর্যকেই বুঝায় না, বরং দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ক্ষতি, ব্যর্থতা ও বঞ্চনাকে বুঝায়। এ ব্যাপারে 'এ কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল কুরআন পরকালে মানুষের সাফল্য লাভকেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ এবং সেখানে তার ব্যর্থতাকেই প্রকৃত 'খাসারা' বা ক্ষতি মনে করে। দুনিয়ার মানুষ সাধারণত যে জিনিসকে কল্যাণ মনে করে আসলে তা কল্যাণ নয়। উহার পরিণাম এ দুনিয়াতেই ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না। আর যে জিনিসকে লোকেরা 'খাসারা' বা ক্ষতি মনে করে, আসলে প্রকৃত পক্ষে তা ক্ষতি নয়, এ দুনিয়ায়ও তা কল্যাণের উপায় মাত্র। তাই এই সূরায় যে ক্ষতি বা ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের ক্ষতির কথায় বলা হয়েছে। আর এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে, সেখানে দুনিয়া ও আখেরাতের বাঁচার কথায় বলা হয়েছে।

দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি বা ধ্বংস থেকে বাঁচার উপায়ঃ

এই সূরায় মানুষের চরম ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে যে চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে, তাহলো ঃ (ক) ঈমান, (খ) সৎ কাজ, (গ) পরস্পরকে সত্য বা হকের উপদেশ দেয়া এবং (ঘ) সবরের উপদেশ দেয়া।

এ চারটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিকেন্দ্রীক এবং পরবর্তী দু'টি সমাজ কেন্দ্রীক। অর্থাৎ প্রথম দুটি আত্ম সংশোধনমূলক আর পরের দু'টি সমাজের অন্যান্য মানুষের হেদায়েত এবং সংশোধনের জন্য।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত কাজ দু'টির প্রথম কাজটি হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থা 'যারা ঈমান আনে"।

ঈমান কি? কুরআন মজিদের কয়েকটি স্থানে কেবলমাত্র মুখে স্বীকার করাকে ঈমান বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈমান অর্থ খোলামনে মেনে নেয়া এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা। মোট কথা ঈমানের মাধ্যম হলো তিনটি–

(১) **তাশ্‌দিক বিল-জিনান**- অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস।

(২) **ইকরার বিল-লিসান**- মুখে স্বীকৃতি, বা বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ।

(৩) **আ'মাল বিল-আরকান**- বাস্তবে কাজে পরিণত।

অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ এবং সেই অনুযায়ী কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

ঈমানের বিষয় ঃ ঈমানের প্রধান ও মূল বিষয় হলো তিনটি।

(১) **তাওহীদে বিশ্বাস ঃ** অর্থাৎ আল্লাহ্ একক, তাঁর কোন শরীকদার নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, তিনি রিযিক দাতা, আইনদাতা ও সকল সৃষ্টি জীবের লালন-পালনকারী। ইবাদত বন্দেগী পাবার অধিকারী একমাত্র তিনিই। ভাগ্য নির্ধারণের মালিকও তিনি। তাঁর উপরই ভরসা এবং তাওয়াক্কুল করতে হবে। তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না এবং সাহায্য চাইতে হলে তার কাছেই চাইতে হবে ইত্যাদি তাওহীদে বিশ্বাস।

(২) **রিসালাতে বিশ্বাস ঃ** নবী-রাসূল, কিতাব ও ফেরেশতা এই তিনের সমন্বয়ে হলো রিসালাত। অর্থাৎ জীবরাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলদের উপর ওয়াহী অর্থাৎ কিতাব নাযিল হয়। এই তিনটি বিষয়ের উপর বিশ্বাসই হলো রিসালাতে বিশ্বাস।

(৩) **আখেরাতে বিশ্বাস ঃ** অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর হতে যে জীবন আরম্ভ হয়, যেমন- কবরের সওয়াল জওয়াব, কবরের আযাব, কিয়ামত, হাশর, লৌহ-কলম, মিজান, আমলনামা পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির সমন্বয়ে আখেরাত। অর্থাৎ এসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার নামই হলো আখেরাতের উপর ঈমান।

www.pathagar.com

প্রকৃত ঈমান কি? কুরআন মজীদে যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে তা হলো সন্দেহ সংশয়মুক্ত ঈমান। সন্দেহহীনভাবে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকাকে প্রকৃত ঈমান বলেছে। এ সম্পর্কে সূরা হুজরাতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ـ

"সেই সব লোকই প্রকৃত পক্ষে মুমিন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোনো রকম সন্দেহে পড়েনি।" (হুজরাত-১৫)

আল্লাহ্ তাআলা সূরা হা-মীম সিজদাহ্তে আরো বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا ـ

"নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ্ই আমাদের রব। অতঃপর এই কথার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকে। (হা-মীম- সিজদাহ-৩০)

মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"প্রকৃত মুমিনতো হলো সে সব লোক, আল্লাহর নাম উচ্চারণ হলে যাদের দেল (ভয়ে) কেঁপে উঠে। (সূরা আনফাল-২)

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে প্রমাণিত হলো যে, ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করা যাবে না, এবং তার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে হবে। আর ঈমানদারেরা যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে তখন তাদের দেল আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠবে এবং ঈমান বেড়ে যাবে অর্থাৎ ঈমান মজবুত হবে। আলোচ্য সূরায় মানুষের চরমক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য প্রথমে যে শর্তটি আরোপ করা হয়েছে তা হলো এ ধরনেরই ঈমান। যাদের মধ্যে এ ধরনের ঈমান নেই তারা কিছুতেই মহাক্ষতি হতে নিস্তার পেতে পারে না।

দ্বিতীয় কাজ ঃ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় হলো 'আমলে সলেহ' বা সৎ আমল, নেককাজ বা ভালোকাজ কিংবা কল্যাণকর কাজ। সব রকমের নেক এবং ভালো কাজই হলো 'আমলে

www.pathagar.com

সলেহ’। যেমন- আল্লাহ এবং বান্দার হক আদায় করা, মা বাপের খেদমত করা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করা, চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া, প্রতিটি কাজ-কামে সুন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা ইত্যাদি আমলে সলেহ বা নেক কাজের মধ্যে গণ্য।

নেক কাজ কবুলের জন্য ঈমান শর্ত ঃ কুরআন মজীদে যেখানেই আমলে সালেহ বা নেক কাজের কথা বলা হয়েছে সেখানেই তার আগে ঈমানের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা কাজটি দেখতে যতই সুন্দর, কল্যাণকর এবং নেক মনে হোক না কেন যদি তার সাথে ঈমান সংযুক্ত না থাকে তা হলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণ হবে না। এ জন্য যদি কোনো অমুসলিম ভালো কাজ বা জনকল্যাণমূলক কাজ করে তবে তার প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে শেষ করা হবে। আখেরাতে বা পরকালে তা গ্রহণ করা হবে না এবং কোনো প্রকার প্রতিদানও দেয়া হবে না।

এ কারণে কুরআন মজীদে যত সুসংবাদই দেয়া হয়েছে, তা কেবলমাত্র তাদের জন্যই দেয়া হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর নেক আমল করে। আলোচ্য সূরাই এ কথাটিই বলা হয়েছে। এ সূরার ঘোষণা অনুসারে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য, তা হলো ঈমানের পর নেক আমল করা। মোট কথা নেক আমল ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারবে না।

তৃতীয় কাজ ঃ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ধ্বংস বা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত যে দুটি গুণের বা কাজের কথা আলোচনা করা হলো তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এদুটি গুণ থাকা অপরিহার্য। এখান থেকে বাকী যে দুটি গুণ বা কাজের কথা বলা হয়েছে তা সামষ্টিক পর্যায়ের। অর্থাৎ সামষ্টিক পর্যায়ের প্রথম কাজ বা গুণটি হলো তারা একে অপরকে হক ও সত্যের নসিহত বা উপদেশ দেয়। অর্থাৎ নিজেকেই শুধু ঈমানদার ও নেক আমলের অধিকারী হলে চলবে না। বরং ঈমানের দাবী পূরণের জন্য সমাজের অন্যান্য লোককেও সত্য পথের ও হক কাজের দাওয়াত দিতে হবে। একটা গোটা সমাজকে ঈমানের ভিত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী করে গড়ে তোলার জন্য সমাজের একজন সচেতন ও

www.pathagar.com

দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। আর এ কাজটি করা কারো একার দায়িত্ব নয়, বরং সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকেরই একে অপরের দায়িত্ব।

حَقٌّ 'হক' শব্দটি বাতিলের বিপরীত। এ 'হক' শব্দটি সাধারণত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থ হলো সহীহ্ ঠিক ও নির্ভুল, সত্য এবং ইনসাফ ও সুবিচার মোতাবেক এবং প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ কথা। সেটা ঈমান ও আকীদার কথাই হোক বা বৈষয়িক কাজ কাম সম্পর্কে কথা হোক।

দ্বিতীয় অর্থ হলো- অধিকার। এ অধিকার আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক বা নিজের অধিকার হোক না কেনো সবই এর মধ্যে শামিল। আর এসব অধিকার এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তা যথাযথভাবে আদায় করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য।

'হক' নসীহত বা উপদেশ দেবার অর্থ হলো ঈমানদার লোকদের সমাজে বাতিল শক্তিকে কখনও মাথা তুলতে দেখে এবং হকের বিপরীত কোনো কাজ হতে দেখে মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। বরং তা দেখা মাত্রই প্রতিরোধ করার জন্য দলবদ্ধভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। পক্ষান্তরে যেই সমাজের লোকেরা এই ভূমিকা পালন করে না সেই সমাজ ক্ষতি ও ধ্বংস হতে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। এমন কি যে সব লোক ব্যক্তিগত জীবনে 'হক' নিয়ে থাকে কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে 'হক' বিপর্যস্ত হয়ে যেতে নীরবে দেখতে থাকে, তা রক্ষা করার জন্য কোনো চেষ্টাই করে না, এই মহা ক্ষতি হতে শেষ পর্যন্ত তারাও রক্ষা পাবে না। এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে-

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

"বণী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো তাদেরকে হযরত দাউদ এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে, তার কারণ এই

ছিলো যে, তাদের সমাজে প্রকাশ্যভাবে ও সাধারণ পর্যায়ে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজ অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু সমাজের লোকেরা পরস্পরকে তাহতে বিরত রাখতে চেষ্টা করা ত্যাগ করেছিলো। (মায়িদা-৭৮-৭৯)

সূরা আ'রাফে এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে "বনী ইসলাঈলীরা (দাউদ আঃ এর যুগে) শনিবারের নিষেধ বাণীর বিরোধীতা করে যখন মাছ ধরতে শুরু করলো তখন তাদের উপর আযাব নাযিল করা হলো। সেই আযাব হতে কেবল সেই সব লোকেরাই রক্ষা পেলো যারা এই গুনাহ্‌র কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলো।"

যারা অন্যায় কাজে জড়িত থাকে কেবল তারাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়, তাদের জন্য সমাজের অন্যান্য সকলকেই ক্ষতিগ্রস্থ্ হতে হবে।

'সূরা'- আনফালে বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে-

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

"রক্ষা পেতে চেষ্টা করো সেই বিপদ হতে যার আঘাত বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, তোমাদের মধ্য হতে যেসব লোক সেই গুনাহ্ কার্যত করেছে। অর্থাৎ সবাইকে আঘাত করবে। (২৫ আয়াত)

এ বিষয়টি হাদীস শরীফে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- 'নবী (সাঃ) সমাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা (আদেশ-নিষেধ) এর মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের উদাহরণ একটি দ্বিতল জাহাজের যাত্রীদের সাথে তুলনা করে বলেনঃ একদল লোক দ্বিতল জাহাজে আরোহনের জন্য কোরা (লটারী) করলো। তাতে কারো ভাগ্যে পড়লো জাহাজের নীচের তলা আর কারো ভাগ্যে পড়লো উপরতলা। নীচের তলার লোকেরা পানির জন্য উপর তলার লোকদের কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকায় তাদের কষ্টের ও বিরক্তের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই নীচ তলার একজন (ক্ষীপ্ত হয়ে) একখানা কুড়াল নিয়ে (পানির জন্য) নৌকার তলা ছিদ্র করতে শুরু করলো। এ দেখে উপর তলার লোকেরা এসে তাকে বললো, কি হয়েছে? তুমি এভাবে (ছিদ্র) করছো কেনো? সে জবাবে বললো, আমাদের জন্য

www.pathagar.com

তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো, অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এভাবে (পানির জন্য) ছিদ্র করছি। (রাসূল বলেনঃ) এখন (নৌকার) সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তাহলে ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও (পানিতে ডুবে মরা হতে) বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। (বুখারী-২৪৯১ নং হাদীস) কুরআন এবং হাদীস থেকে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সমাজের এক শ্রেণীর লোক খারাপ কাজ করলে সবাই মিলে তাকে বাধা দিতে হবে। নচেৎ এ কাজের জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঠিক এ কারণেই اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ 'সৎ কাজের আদেশ' এবং نَهِىْ عَنِ الْمُنْكَرْ 'অর্থাৎ কাজের নিষেধ' করা মুসলিম উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে (ঈমরান-১০৪) আর যারা এ কর্তব্য পালন করে তাদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলে আল্লাহ্ বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান হয়েছে। (ইমরান-১১০)

চতুর্থ কাজ ঃ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ সমাজের লোকদের পরস্পরকে 'হক' বা সত্য পথের উপদেশ দেবার সাথে সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য ঈমানদার লোক ও তাদের সমাজের উপর দ্বিতীয় যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হলো- সমাজের লোকদের পরস্পরকে 'সবর' ও 'ধৈর্য্যের উপদেশ দান করা। কেন না সমাজের কোনো লোক যখনই সত্য দ্বীন মেনে চলতে যাবে এবং হকের উপর চলা ও টিকে থাকার জন্য অন্যান্য লোকদেরকে নসিহত বা উপদেশ দেবে এবং বাতিলের উত্থানকে দমনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে, তখনই তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ঠে পড়তে হবে এবং বাতিলের পক্ষ থেকে চরম বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এমতাবস্থায় নিজেকে এবং হক পন্থীদেরকে এসব দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এবং বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে হকের উপর টিকে থাকা এবং সামনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারনের জন্য উপদেশও দিতে হবে।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগত দু'টি এবং সামষ্টিকভাবে দু'টি মোট চারটি গুণ যদি কারো মধ্যে না থাকে, তবে নিশ্চিত ভাবে দুনিয়া এবং আখেরাতের চরম ক্ষতি বা ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে। পরকালের ক্ষতি মানেই হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা! কুরআনের এই ছোট্ট সূরা আল আসরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের পর তা থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি তা হলো-

● আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে হায়াত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার প্রতিটি মুহূর্তেকে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মনে করে নেক ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে। কোনোভাবেই সময়কে অন্যায়-অপকর্ম ও অসৎ কাছে অতিবাহীত করা যাবে না।

● আখেরাতের জীবনের কল্যাণ এবং ক্ষতিকেই প্রকৃত কল্যাণ এবং ক্ষতি মনে করতে হবে।

● দুনিয়ার সাময়িক ক্ষতি এবং আখেরাতের স্থায়ী ক্ষতি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য নীচের দুটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের কাজ এবং দুটি সামাজিক কাজ করতে হবে।

● **ব্যক্তিগত কাজ দুটি হলো-**

(১) নিষ্ঠাবান পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে।

(২) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নেক ও সৎ আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে।

● **সামাজিক অপর দুটি কাজ হলো-**

(১) সমাজকে ঈমানদার এবং পরিশুদ্ধ করার জন্য পরস্পরকে হক বা সত্য কাজ করার উপদেশ দিতে হবে এবং বাতিল শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

(২) সত্য ও হক কথা এবং কাজ করতে এবং বাতিলের মোকাবিলা করতে গিয়ে যতো প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং বাধা-বিপত্তি আসুক না কেনো তার উপর টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ধরার এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বনের উপদেশ দিতে হবে।

www.pathagar.com

● সর্বপরি আখেরাতের মহাক্ষতি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য উপরোক্ত কাজগুলো সঠিকভাবে করা এবং সেই কাজের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সার্বক্ষণিক দোয়া এবং সাহায্য কামনা করতে হবে।

আহ্বান ঃ সম্মানিত ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আল আসরের যে দরস পেশ করলাম, তাতে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় এ জন্য আল্লাহ্ তাআল্লার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আখেরাতের মহাক্ষতি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে সূরা আসরের শিক্ষানুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে দরস শেষ করছি। আমিন। অয়া আখেরুদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বালি আলামীন।

www.pathagar.com

পাঁচ

কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়

সূরা সফ্ ঃ ১০-১৩ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ
تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ
وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○
يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১০) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে? (১১) তা হলো এই যে, তোমরা (ভালভাবে) ঈমান আনো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আর তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য অতী উত্তম, যদি তোমরা (এর গুরুত্ব) বুঝ। (১২) তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহ্-খাতা মাফ করে

www.pathagar.com

দেবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আর চিরকাল বসবাসের জান্নাতে তোমাদের অতি উত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সাফল্য। (১৩) এছাড়া আরও অন্যান্য নিয়ামত তোমাদেরকে দান করবেন যা তোমরা পছন্দ করো। তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং খুব নিকবর্তী বিজয়। হে নবী! ঈমানদার লোকদেরকে এর সুসংবাদ জানিয়ে দিন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا – ওহে, হে। اَلَّذِيْنَ – যারা। اٰمَنُوْا – ঈমান এনেছো। هَلْ – কি? اَدُلُّكُمْ – আমি তোমাদের সন্ধান দেবো। عَلٰى – উপর (এখানে সম্বন্ধে)। تِجَارَةٍ – ব্যবসা। تُنْجِيْكُمْ – তোমাদের মুক্তি দেবে। مِنْ – থেকে। عَذَابٍ – শাস্তি। اَلِيْمٍ – কষ্টদায়ক। تُؤْمِنُوْنَ – তোমরা ঈমান আনো। بِ – সাথে। وَ – ও। رَسُوْلِهٖ – তার রাসূল। وَ – এবং। تُجَاهِدُوْنَ – তোমরা জিহাদ করো। سَبِيْلِ – পথে। بِاَمْوَالِكُمْ – তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে। اَنْفُسَكُمْ – তোমাদের জান-প্রাণ দিয়ে। ذٰلِكُمْ – এটাই। خَيْرٌ – উত্তম। لَكُمْ – তোমাদের জন্য। اِنْ – যদি। كُنْتُمْ – তোমরা। تَعْلَمُوْنَ – জানো। يَغْفِرْ – তিনি মাফ করবেন। لَكُمْ – তোমাদের জন্য। ذُنُوْبَكُمْ – তোমাদের গুনাহ সমূহ। يُدْخِلْكُمْ – তোমাদের প্রবেশ করাবেন। جَنّٰتٍ – বাগান বেষ্টিত (জান্নাত)। تَجْرِىْ – প্রবাহিত হয়। تَحْتِهَا – তার পাদদেশে (নীচে)। اَلاَنْهٰرُ – ঝর্ণাসমূহ। مَسٰكِنَ – বাসগৃহ সমূহ। طَيِّبَةً – উত্তম। عَدْنٍ – চিরস্থায়ী। اَلْفَوْزُ – সাফল্য। اَلْعَظِيْمُ – মহা। اُخْرٰى – অন্য। تُحِبُّوْنَهَا – যা তোমরা পছন্দ করো। نَصْرٌ – সাহায্য। فَتْحٌ – বিজয়। قَرِيْبٌ – আসন্ন বা নিকটে। اَلْمُؤْمِنِيْنَ – মুমিনদের। بَشِّرْ – সুসংবাদ দাও।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ইসলামপ্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা। আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল

কুরআনের সূরা সফ্ এর দ্বিতীয় রুকুর ১০ থেকে ১৩ মোট চারটি আয়াত তিলাওয়াত এবং বাংলা অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সঠিকভাবে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। আমিন! অমা তাওফিকী ইল্লাহ্‌বিল্লাহ্।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৪নং আয়াত- يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا হতে এর নাম করণ করা হয়েছে। صَفّ (ছফ) শব্দের অর্থ হলো কাতারবদ্ধ বা দলবদ্ধ। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে صَفّ (ছফ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (সূরার নাম করণ সংক্রান্ত আরো প্রয়োজনীয় তথ্য এক নং দারসে উল্লেখ করা হয়েছে)।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সর্বসম্মত মতে এই সূরাটি মাদানী। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরাটি নাযিলের সময়কাল জানা যায়নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সূরাটি ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক সময় অবতীর্ণ হতে পারে। কেননা এতে যে অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এই সময়টিই বিরাজ করছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ সংক্ষেপে সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো- ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে জান-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহ প্রদান।

দারসে আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হলো- দুর্বল ঈমানদার লোকদেরকে দৃঢ় ও মজবুত ঈমানের ভিত্তিতে আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে নাজাত, পাপ কাজের ক্ষমা, জান্নাত লাভ এবং দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় লাভের জন্য নিজের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তিরমিযীর হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তাহলে উহা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেন যে, তাঁরা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজটি কি জানতে

www.pathagar.com

পারলে আমরা তার জন্যে জান ও মাল সবকিছুই উৎসর্গ করতাম। (মাযহারী)

তাফসীরে ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পর এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু কারও হিম্মত হলো না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (এতে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হন।) তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলে তিনি তাঁদেরকে সূরা 'ছফ' পুরোটাই পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই তাঁদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো।

এ সূরা থেকে জানা যায় যে, সাহাবারা সবচেয়ে প্রিয় যে আমলটির তালাশে ছিলেন, সেটি হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদ। তবে আল্লাহ্ তাআলা এই সূরাতেই তাঁদের এ ধরনের আগে বেড়ে আমল তালাশের সমালোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা 'ছফ' এর তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় বিবরণ দেবার পর আপানাদের সামনে অত্র আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দেবে?"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদার লোকদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে যে প্রিয় আমল জিহাদকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য এমন জিনিস যাতে মানুষ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করে। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য

www.pathagar.com

করেই এখানে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাকে তিজারাত বা ব্যবসা-বাণিজ্য বলা হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন মানুষকে অভাব অনটন থেকে বাঁচিয়ে দুনিয়ার কষ্ট থেকে নিস্তার দেয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও ঈমানদার লোকদেরকে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব বা শাস্তি থেকে নিস্তার দেয়।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ -

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (ভালো করে) ঈমান আনো এবং তোমাদের জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো।"

ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যেমন অর্থ-সম্পদ, সময়, শ্রম, চেষ্টা-সাধনা, মেধা এবং যোগ্যতাকে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করতে হয়, তেমনিভাবে জিহাদ পরিচালনার জন্যও মূলধন পুঁজি হিসেবে মজবুত ঈমান, অর্থ-সম্পদ, জীবন অর্থাৎ সময়, শ্রম, চেষ্টা-সাধনা, আত্মত্যাগ ইত্যাদিকে বিনিয়োগ করতে হয়।

সূরা তাওবায় এ বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান ও মাল-সম্পদকে তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আর তারা যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা (দুষমনদেরকে) মারে ও নিজেরা মরে।" (তাওবাহ ঃ ১১১)

এই আয়াতেও জিহাদকে ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই ব্যবসায় মুমিন লোকদের পুঁজি হলো তাদের জান-মাল আর আল্লাহ্‌র পুঁজি হলো জান্নাত। এখানে আল্লাহ্ মুমিনদের জান-মালকে খরিদ করার ওয়াদা করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।

www.pathagar.com

ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলার অর্থ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জিহাদ করার জন্য ঈমানদার লোকদেরকে পুনরায় ঈমান আনতে বলার অর্থ হলো– খাঁটি নিষ্ঠাবান মুসলমান হতে বলা। মুখে মুখে শুধু ঈমানের দাবীকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক নয়, বরং যে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে, সেই বিষয়ের উপর টিকে থাকার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকা। কেননা আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য যে ব্যবসা তার মূল পুঁজিই হলো মজবুত ঈমান। নড়বড়ে, গতানুগতিক ঈমান নিয়ে জিহাদের এ ব্যবসা করা কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদের জন্য প্রথমেই – تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ বলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মজবুত ও দৃঢ় ঈমান আনার জন্য তাগাদা দিয়েছেন।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ "দুনিয়ার ব্যবসায়ের তুলনায় এই জিহাদের ব্যবসায় তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমর এর গুরুত্ব বুঝো।" দেখা যায় সব সময় এক শ্রেণীর মুসলমান অতি সহজে এবং চোরা পথে আখেরাতের আযাব থেকে বেঁচে জান্নাতে যেতে চায়। অথচ কুরআন এবং হাদীসে এমন কোনো পথের সন্ধান দেয়া হয়নি যাতে সহজেই জান্নাতে যাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরানে বলেন–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনো আল্লাহ (পরীক্ষা করে) দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং জিহাদের এই লাভবান ব্যবসার গুরুত্ব বোঝে তাদেরকে এই কথা বলেছেন যে, এটাই

www.pathagar.com

জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জান্নাতে যাবার উত্তম পথ যদি তোমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করো।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

অর্থাৎ "তাহলে তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর চিরদিন বসবাসের জান্নাতে তোমাদেরকে অতি উত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।"

ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন উদ্দেশ্য থাকে লাভ করা বা মুনাফা অর্জনের, তেমনিভাবে জিহাদের এই ব্যবসায় ঈমানের সাথে জান-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে যেসব নিয়ামত পাওয়া যাবে এই আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আখেরাতের প্রতিদান ঃ জিহাদের প্রতিদান বা মুনাফা হিসেবে আল্লাহ তাআলা দান করবেন যা পরকালে পাওয়া যাবে। আর এটাই হলো ব্যবসায়ের আসল মুনাফা। সেগুলো হলো ঃ

- জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি।
- ঈমানদার জিহাদকারীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।
- তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নেয়ামতসমূহ অশেষ ও চিরন্তন অবিনশ্বর।

তাছাড়া আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে যারা মারা যায় তাদেরকে শহীদ বলা হয়েছে। তাদের প্রতিদান সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) তাঁর বাণীতে বলেন– অল্লাহ্র কাছে শহীদ ব্যক্তির ছয়টি প্রতিদান রয়েছে ঃ

(১) প্রথম রক্তপাতেই তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

(২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে।

(৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

www.pathagar.com

(৪) বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

(৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মণি-মুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়ে উত্তম হবে। আর টানাটানা চোখওয়ালী বাহাত্তর জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। এবং

(৬) তাকে তার সত্তরজন আত্মীয়ের শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। (মিশকাত– মেকদাদ ইবনে মা'দিকারিব)

وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط

"এছাড়া আরও অন্যান্য নিয়ামত তোমাদের দান করবেন যা তোমরা পছন্দ করো। তাহলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়।"

দুনিয়ার প্রতিদান ঃ এই আয়াতে জিহাদকারীদের পরকালের প্রতিদানের সাথে দুনিয়াতেও কিছু প্রতিদান দেয়া হবে তার কথা বলা হয়েছে।

وَأُخْرٰى শব্দটি نِعْمَتْ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও উত্তম বসবাসের ঘর জান্নাত তো পাওয়া যাবেই; দুনিয়াতেও একটা নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদেরকে পরাজিত করার মাধ্যমে বিজয়।

এখানে قَرِيْبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। আর যদি প্রচলিত অর্থে قَرِيْبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর হবে মক্কা বিজয়।

تُحِبُّوْنَهَا এখানে আল্লাহ তাআলা জিহাদকারী মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমরা তো এই নগদ নেয়ামত বা প্রতিদান খুব পছন্দ করো। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে– وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ "মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে।" এর অর্থ এই নয় যে, পরকালের নেয়ামত বা প্রতিদান তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের কাছে প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে পেতে চায়, তাও দেয়া হবে।

www.pathagar.com

দুনিয়ার বিজয় ও সাফল্য লাভও যে আল্লাহ তাআলার একটা বড় নেয়ামত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুমিন বান্দাহ্র কাছে আসল গুরুত্ব এর নয়, বরং পরকালীন সাফল্যই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে ফল লাভ হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে। আর যে ফল পরকালে পাওয়া যাবে তার উল্লেখ সর্বপ্রথম করা হয়েছে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা, সূরা 'ছফ' এর ১০ থেকে ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর যেসব শিক্ষা লাভ করা যায় তা হলো–

● পরকালের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার একমাত্র পথই হলো বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

● জিহাদ করার জন্য মুখে মুখে শুধু ঈমানের বুলি না আউড়িয়ে জিহাদে যে ঝুঁকি আছে তার মোকাবেলার জন্য মজবুত ও দৃঢ় ঈমানদার মুসলমান হতে হবে।

● আখেরাতের সফলতা অর্থাৎ গুনাহ্ মাফ ও জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করার জন্য নিজের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য যখন যা দরকার তা খরচ করা এবং সময় দান, চেষ্টা-সাধনা ও চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রয়োজনে আল্লাহ্র পথে জীবন দান করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা।

● পরকালের নেয়ামত ভোগ করার আগেই আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় নগদ নেয়ামত দানের যে ওয়াদা করেছেন তাকেই প্রকৃত সফলতা মনে না করা, বরং পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামতকেই প্রকৃত সফলতা মনে করা। আর দুনিয়ায় সফলতা বা বিজয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং পেরেশান না হওয়া।

আহ্বান ঃ সম্মানিত ভায়েরা, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা ছফ থেকে কয়েকটি আয়াতের দরস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর একজন মুমিনের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নাজাতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী নেয়ামত জান্নাত লাভ, তার জন্য আমরা যেনো জিহাদকেই প্রকৃত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিজের জান-মাল কোরবান করতে পারি, তার তাওফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। আমিন!

[সালাম দিয়ে শেষ করবেন।]

www.pathagar.com

ছয়
মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ
সূরা নিসা ৭৫-৭৬ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج
وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ
الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (৭৫) আর (হে মুমিনেরা) তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই (যুদ্ধ) করছো না সেই সব দুর্বল পুরুষ, অসহায় নারী এবং শিশুদের পক্ষে, যারা (উৎকণ্ঠার সাথে) বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার করো। (এরা তো খুব জালেম)! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের (পক্ষ অবলম্বনকারী) অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী ঠিক করে দাও। (৭৬) আর ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে। আর অপর

www.pathagar.com

পক্ষে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের (শয়তানের) পক্ষে। অতএব তোমরা জেহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে- (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ - এবং। مَا - কি? لَكُمْ - তোমাদের জন্য। لَا - না। تُقَاتِلُوْنَ - তোমরা লড়াই করবে। فِىْ - মধ্যে। سَبِيْلِ - পথ। اللّٰهِ - আল্লাহ। اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ দুর্বলেরা। مِنْ - হতে। الرِّجَالِ - পুরুষেরা। النِّسَاۤءِ - নারীরা। الْوِلْدَانِ - শিশুরা। اَلَّذِيْنَ - যারা। يَقُوْلُوْنَ - তারা বলে। رَبَّنَا - আমাদের রব, প্রতিপালক। اَخْرِجْنَا - আমাদের বের করো। هٰذِهِ - এই। الْقَرْيَةِ - জনপদ (এলাকা)। ظَالِمِ - অত্যাচারী। اَهْلُهَا - তার অধিবাসী। اَجْعَلْ لَنَا - আমাদের জন্য বানিয়ে দাও। لَّدُنْكَ - তোমার পক্ষ থেকে। نَصِيْرًا - সাহায্যকারী। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমানদারেরা। يُقَاتِلُوْنَ - তারা লড়াই করে। كَفَرُوْا অবিশ্বাসীরা। الطَّاغُوْتِ - প্রত্যাখানকারী (শয়তান)। فَقَاتِلُوْا - অতএব তোমরা যুদ্ধ করো। اَوْلِيَاۤءَ - বন্ধু বা অভিভাবক। اِنَّ - নশ্চয়। كَيْدَ - চক্রান্ত। ضَعِيْفًا - দুর্বল।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ভাইয়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা নিসা-এর ৭৫ ও ৭৬ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও বাংলায় অনুবাদন পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের মাঝে সঠিক ভাবে এবং সহিহ্ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

নামকরণ ঃ আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত - وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً এর وَنِسَاۤءً শব্দ থেকে সূরার নাম করণ করা হয়েছে। মোট কথা এ সূরাটি এমন যার মধ্যে نِسَاء (নিসা) শব্দটি

www.pathagar.com

উল্লেখ রয়েছে। نِسَاء (নিসা) মানে হলো স্ত্রীলোক। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য এক নম্বর দারসে দেখুন)।

সূরাটি নাযিল হবার সময় কাল ঃ সর্ব্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। তবে সূরাটি একই সময় নাযিল হয়নি। এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সূরার বিষয়বস্তু এবং ঘটনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় ওহুদ যুদ্ধের পর অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময় কালের মধ্যে বিভিন্ন সময় এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় ঃ মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় ইসলামী সমাজ গঠনের দু'তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর সূরাটি নাযিল হয়। বিধায় এই সূরাতে ইসলামী সমাজের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়গুলোই বেশী আলোচিত হয়েছে। এই সূরায় পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়ে-শাদীকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজের নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম কানুন, অর্থনৈতিক লেন-দেনের পদ্ধতি এবং ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধের শাস্তির বিধান এবং মদ পান নিষেধ করা হয়েছে। পাক-পবিত্রতার বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তার বান্দাহদের সাথে পরহেজগার লোকদের সম্পর্ক কেমন হবে তা বলা হয়েছে। মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদের দলীয়-সংগঠন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিধান দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাব এবং মুনাফেকদের কাজের সমালোচনা এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কোন খবর পেলে তা তাৎক্ষণিক প্রচার না করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দেবার জন্য বলা হয়েছে। ওজু ও গোছলের বিকল্প তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইহুদীদের অসংগত কাজের জন্য মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ গোত্রের সাথে কি ধরনের ব্যবহার হবে তার বিধান শিখানো হয়েছে। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষে ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য ঃ দরসের জন্য তেলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বক্তব্য হলো সমাজের নির্যাতিত অসহায় দুর্বল নারী, পুরুষ এবং শিশুদেরকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচার জন্য জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুমিন বান্দাহরা আল্লাহর পথে এবং বাতিল শক্তি শয়তানের পথে জিহাদ করে তা বলা হয়েছে। আর তাগুতি শক্তির ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অভয় দান করা হয়েছে।

শানে নুযূল বা অবতরণের কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় হিজরাত করার পরেও মক্কায় এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা শারিরীক দুর্বলতা এবং আর্থিক অনটনের কারণে হিজরাত করতে পারেননি। এদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস ও তার মা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ। (কুরতবী)। পরে কাফেরেরাও তাদেরকে হিজরাত করতে বাধা দিতে থাকে এবং নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করতে থাকে, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুণ কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর টিকে থাকেন। আর তারা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে নিস্তার লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সেই ফরিয়াদ কবুল করে মুসলমানদের জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে নির্যাতিত এ অসহায় লোকদেরকে উর্দ্ধারের জন্য অত্র আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপস্থিত সম্মানিত ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত অত্র আয়াত এবং সূরা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপুর্ণ কিছু বিবরণ দেবার পর এখন আপনাদের সামনে আয়াত দু'টির সংক্ষিপ্তি ব্যাখ্যা পেশ করছি।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

www.pathagar.com

অর্থাৎ "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না অসহায় দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা ফরিয়াদ করে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই অত্যাচারী (মক্কা) নগরী থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক ঠিক করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের (উদ্ধারের)জন্য সাহায্যকারী পাঠাও।"

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মক্কায় থেকে যাওয়া দুর্বল, অসহায় নারী-পুরুষ এবং শিশুদের মক্কার কাফেরেরা ইসলামের পথ পরিহার করার জন্য কঠিন শারিরীক এবং মানসিক নির্যাতন চালাতো। কিন্তু এসব মুমিন নারী-পুরুষেরা শারিরীক দুর্বলতা এবং আর্থিক অনটনের জন্য রাসুলের সাথে হিজরাত করতে না পারলেও হাজারো নির্যাতনের পরেও তারা ইসলাম ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজি ছিল না। এ জন্য তারা ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্যই আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিলো হে আল্লাহ তুমি হয় আমাদেরকে এই জালেম (মক্কা) নগরী থেকে বের করার ব্যবস্থা করো, নতুবা তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য সহায়ক বন্ধু, অভিভাবক এবং সাহায্যকারী পাঠাও।

উল্লেখ্য যে আল্লাহ তাআলা এই মাজলুম অসহায় ব্যক্তিদের দুটি ফরিয়াদই এভাবে কবুল করেছিলেন যেমন- মক্কা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়ে তাদের প্রথম আবেদন পূরণ করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয় আবেদন পূরণ করেছিলেন।

তাই আল্লাহ তাআলা মক্কার দুর্বল অসহায় বন্দী নির্যাতিত মুসলমানদের ডাকে সাড়া দিয়ে মদীনার মুসলমানদেরকে উল্লেখ করে বলেন ঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এমন অসহায় দুর্বল বন্দী নির্যাতিত মুসলমানদেরকে উদ্ধারের জন্য জেহাদ করছো না। যেখানে কঠোর এবং অমানবিক নির্যাতনের দ্বারা মানবতা লুন্ঠিত হচ্ছে। অথচ মাজলুমকে সাহায্য করা এবং মানবতাকে রক্ষা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জেহাদ করাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোনো ভালো মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

www.pathagar.com

প্রিয় ভায়েরা তৎকালীন মক্কার কাফের এবং মুশরিকদের দ্বারা যেভাবে দুর্বল, অসহায় নারী পুরুষদেরকে ঈমান চ্যুত করার জন্য অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিলো। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগেও সারা দুনিয়ার মুসলমান অসহায় নারী-পুরুষ এবং শিশুরাও ইহুদী, খৃস্টান, মুশরিক এবং মুসলমান নামধারী ধর্মনীরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। তারা মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। যেমন ইউরোপিয়ান দেশ বসনিয়া এবং আলবেনিয়ার মুসলমানদেরকে ইহুদী নাসারাদের দোসর সার্ব এবং ক্রোট নরপশুরা ধর্ষণ, হত্যা, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এবং নিজের দেশ থেকে বিতাড়োনর মাধ্যমে চরম নির্যাতন চালাচ্ছে।

মুসলমানদের দেশ ফিলিস্তিনকে গ্রাস করার জন্য মুসলমানদের চির দুষমন ইসরাইলের ইহুদীরা মুসলমানদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদেরকে গুম, হত্যা এবং জেল জুলুমের মাধ্যমে চরম নির্যাতন করছে।

কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে ভারতের মুশরিক সেনারা তাদেরকে মুশরিক বানানোর জন্য হত্যা, ধর্ষণ এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে মানবতা বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনিভাবে আলজেরিয়ায় যাতে কোনো দিন মুসলমানেরা ঈমান আকিদা নিয়ে বাঁচতে না পারে তার জন্য সেখানে ইহুদী আমেরিকার এজেন্ট ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদী সামরিক সরকারের গোপন বাহিনী দিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম, পাড়াকে পাড়া, নারী-পুরুষ এবং শিশুদের ব্রাস ফায়ার করে এবং যবাই করে হত্যা করছে এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের জেল যুলুমের মাধ্যমে নির্যাতন চালাচ্ছে।

তুরস্কে চিরদিনের জন্য ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য কট্টর ধর্মনীরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা ইসলামের অনুসারীদের চরম নির্যাতন করা হচ্ছে এবং ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন এবং আকিদাকে পরিকল্পিতভাবে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ধর্মনীরপেক্ষতার নামে ইসলাম বিরোধীশক্তি আলেম-ওলামা, পীর-মাসায়েখ, হাফেজ, কারী এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদেরকে হত্যা এবং জেল-জুলুমের

www.pathagar.com

মাধ্যমে নির্যাতন করা হচ্ছে। ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এভাবে যুলুম-নির্যাতনের কারণ একটিই তা হলো মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে ঈমান চ্যুত করা যেনম উদ্দেশ্য ছিল। আজও সারা পৃথিবীর মুসলমান এবং ইসলামি অনুসারীদের ঈমান এবং মুসলমানিত্ব খতম করার জন্য এসব নির্যাতন করা হচ্ছে।

তৎকালীন মক্কায় অবস্থানকারী অসহায় মুসলমানেরা যেমন তাদের ঈমান ও নিজেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর তাআলার কাছে ফরিয়াদ করেছিলো আজকেও ঠিক অনুরূপভাবে নির্যাতিত অসহায় মুসলমান এবং প্রকৃত ইসলামের অনুসারীরা আল্লাহর কাছে তাই ফরিয়াদ করছে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা মক্কার অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য যেমনভাবে আয়াত নাযিল করে মদীনায় মুসলমানদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আজকেও সেই আয়াতও ঈমানদার মুসলমানদেরকে একই নির্দেশ দিচ্ছে। তার কারণ কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ কেবলমাত্র কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালীন লোকদের জন্যই নয়। বরং তার আদেশ-নিষেধ চিরকালীন সব সময়ের জন্য এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকবে। কেননা আল কুরআন হলো পরিপূর্ণ এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব। বিধায় বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের দেশসহ সারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা এবং মাজলুম নির্যাতিত মুসলমানদেরকে উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকের ওপর জেহাদ করা ফরজের মধ্যে বড় ফরজ।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইমানদারদের করণীয় সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

অর্থাৎ "যারা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতি শক্তি শয়তানের পথে।"

www.pathagar.com

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা। আল্লাহর জমিনে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করা হচ্ছে ঈমানদার লোকদের মূল কাজ। এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা হজ্জে উল্লেখ রয়েছে। وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ অর্থাৎ (মুমিনেরা) তোমরা আল্লাহর জন্যই (কেবল) জেহাদ করো যেভাবে জেহাদ করা উচিত।"

সুতরাং যারা প্রকৃত ও সত্যিকার মুমিন তারা কখনো জেহাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

আর অপর দিকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ্ বিরোধী ও খোদাদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের (শয়তানের) পথে লড়াই করা হচ্ছে কুফরী শক্তির কাজ। যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেরেরা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে। কোনো খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ কখনো করতে পারে না।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, দুনিয়াতে সব সময় দুটি দল থাকবে, একটি আল্লাহর দল, অপরটি তাগুতি শক্তি শয়তানের পক্ষের দল। কোরআন এবং হাদীসে তৃতীয় কোনো দলের কথা স্বীকার করা হয়নি। অতএব যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা সাধনা করে তারাই হলো আল্লাহর পক্ষের দল, আর বাকিরা যে দলই করুক না কেনো, যে দলের দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা থাকে না তা সবই তাগুতি শক্তি শয়তানের দল। حِزْبُ اللّٰهِ وَحِزْبُ الشَّيْطٰنِ। অর্থাৎ একটি আল্লাহর দল এবং অপরটি শয়তানের দল।"

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ-

فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

অর্থাৎ "তোমরা শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে থাকো দেখবে শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।" এখানে বলা হয়েছে শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল অত্যন্ত দুর্বল। ফলে তা মুমিনদের

www.pathagar.com

সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং মুসলমানদেরকে তাগুতি শক্তি অর্থাৎ কাফের মোশরেক ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনো প্রকারের দ্বিধা বা সংকোচ করা ঠিক নয়। তার কারণ হলো মুমিনদের সাহায্য কারীতো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। অপরদিকে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই উপকার করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় বলেন ঃ-

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে জয়ী করবেন এবং দলের লোকদের অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন।" (তাওবাহ-১৪)

আয়াতে اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنَ كَانَ ضَعِيْفًا বলে শয়তানের কলাকৌশলকে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সে জন্য আয়াতের মাধ্যমেই দুটি শর্তের বিষয় প্রতীয়মান হয়।

প্রথম শর্ত ঃ যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং **দ্বিতীয় শর্তঃ** সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। দুনিয়ায় কোন কিছু পাবার আশা বা নিজের কোনো স্বার্থ জড়িত থাকবে না। প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দুটি শর্তের কোনো একটির যদি অভাব থাকে তাহলে শয়তান বা তাগুতি শক্তির কলা কৌশল দুর্বল হয়ে পড়বে না।

এ জন্য জেহাদে বা লড়ায়ে আল্লাহর মদদ বা সাহায্য পেতে হলে এবং শয়তানী বা তাগুতি শক্তিকে পরাজিত করতে হলে অবশ্যই মজবুত ঈমান এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা সূরা নিসার ৭৫ এবং ৭৬ নম্বর আয়াত দুটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে তা হলো ঃ-

● প্রথমে নিজের দেশ এবং পরবর্তীতে সারা দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দলবদ্ধ ভাবে জেহাদ বা আন্দোলন করতে হবে।

● দুর্বল অসহায় মাজলুম মুমিন মুসলমানদের সাহায্য এবং উদ্ধারের জন্য ও মানবতাকে রক্ষার জন্য গোটা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

● আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দল ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার দলে জড়িত থাকা যাবে না।

● তাগুতি এবং খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সদাসর্বদা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আইন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে।

● ইসলাম বিরোধী শক্তির অস্ত্রবল, জনবল এবং কুটকৌশল যত বিরাট এবং মজবুত বলে দেখতে মনে হোক না কেনো এতে মুসলমানদের ঘাবড়ানো এবং ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া যাবে না। বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য্যের সাথে টিকে থাকতে হবে। কেননা তাদের এইসব বৈষয়িক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আমি যে দরস পেশ করলাম, এতে যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর সারা দুনিয়ার অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দলবদ্ধভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে দরস শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন। ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনীল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

সাত
ঈমানের পরীক্ষা

সূরা আলে ইমরান ১৩৯-১৪১ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১৩৯) তোমরা হতাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) যদি তোমরা (এখন ওহুদের যুদ্ধে) আঘাত পাও, তাহলে তারাও তো (বিরোধী পক্ষ) তেমনি আঘাত পেয়েছে (বদরের যুদ্ধে)। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। আর (ওহুদের) এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের ওপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান (দেখে নিতে চান) তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার। আর তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। (১৪১) তিনি এই পরীক্ষার দ্বারা সাচ্চা মু'মিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ - আর। لَا تَهِنُوْا - তোমরা নিরাশ হয়ো না, ভীত হয়োনা, দুর্বল হয়ো না। لَا تَحْزَنُوْا - তোমরা চিন্তিত হয়ো না, দুঃখ করো না। اَنْتُمْ - তোমরাই। اَعْلَوْنَ - বিজয়ী হবে, উচ্চ মর্যাদা পাবে। اِنْ - যদি। كُنْتُمْ - তোমরা হও। يَمْسَسْكُمْ - সে তোমাদেরকে স্পর্শ করছে। قَرْحٌ - যখম, আহত, দুঃখ কষ্ঠ। مَسَّ - স্পর্শ। اَلْقَوْمَ - জাতি, দল। مِثْلُهٗ - তার মত, তার অনুরূপ। تِلْكَ - ঐ, এই। الاَيَّامُ - দিনগুলো। نُدَاوِلُهَا - আমরা উহাকে পরিবর্তন করি, আবর্তন ঘটায়। بَيْنَ النَّاسِ - মানুষের মধ্যে, মানুষের মাঝে। لِيَعْلَمَ اللّٰهُ - যাতে আল্লাহ জানতে পারেন। اَلَّذِيْنَ - যারা, কারা। يَتَّخِذُ - সে ধরে, সে বানাচ্ছে / বানাবে। مِنْكُمْ - তোমাদের থেকে, হতে। شُهَدَاءَ - উপস্থিত, সাক্ষীগণ, শহীদগণ। لَايُحِبُّ - সে ভালো বাসে না। الظّٰلِمِيْنَ - অত্যাচারীদের, যালেমদের। لِيُمَحِّصَ - যাতে সে পাক-সাফ করে, খাঁটি করে, পবিত্র করে, নির্ভেজাল করে। يَمْحَقُ - সে ধ্বংস করে, নিশ্চিহ্ন করে।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত উপস্থিতি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় মু'মিন ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনোরা! আস্সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। প্রিয় ভায়েরা আমি আপনাদের সামনে কুরআন শরীফের সূরা আলে ঈমরানের ১৩৯ থেকে ১৪১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত তেলাওয়াত এবং বাংলায় অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে শেষ পর্যন্ত দারস পেশ করার তাওফিক দান করেন। 'অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্'।

সূরার নাম করণ ঃ এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত اٰلَ عِمْرَانَ শব্দ থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেখানে 'আলে ইমরান' সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। একেই সূরার পরিচিতির জন্য নামকরণ করা হয়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এক নম্বর দরসে দেখুন।)

www.pathagar.com

সূরাটি নাযিল হবার সময়-কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি সর্ব সম্মত মতে মাদানী। তবে একই সময় সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়নি। মোট চারটি ভাষণে সূরাটি শেষ হয়েছে। **প্রথম ভাষণটি** সূরার প্রথম থেকে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত চলে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। নবব হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকুর শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ১৩তম রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে বেশি জানেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ সুরায় দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো আহলে কিতাব (ইহুদি ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটি রাসূলের অনুসারী মুসলমান।

সূরার প্রথমে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী এবং খৃস্টানদেরকে জোরালো ভাষায় তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং চারিত্রিক দোষ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সাঃ) এবং আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ রাসূলের অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সত্যের পতাকা বহন এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলে কিতাব ও মুনাফেক মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে, তাদের সেই

www.pathagar.com

আচরণ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান দলটির মধ্যে যে সব দুর্বলতা দেখা দিয়েছিলো তার পর্যালোচনা এবং দুর্বলতা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য ঃ ওহুদের সাময়িক পরাজয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আহত এবং সাহাবীরা আঘাতে জর্জরিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে ভয়-ভীতি, হতাশা এবং দুঃখ বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং মুমিনদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শানে নুযূল বা অবতরণের কারণ ঃ আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কিছু ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম দিকে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানেরা সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করে। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সহ অনেকে আহত হন। কিন্তু এসবের পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের তিনটি কারণ ছিলো ঃ

(এক) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর গীরিপথ রক্ষার জন্য যে সব নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ফলে কেউ কেউ বললো ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিলো এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সেই নির্দেশ ছিলো সাময়িক। অতএব সবার সাথে মিলিত হয়ে গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করা উচিত।

(দুই) খোদ নবী করীম (সাঃ) এর নিহত হবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও মনোভাঙ্গা হয়ে পড়ে।

(তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, সেটাই ছিলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

(সাঃ) উৎসাহী যুবক সাহাবীদের অধিকাংশের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করার মতের ভিত্তিতে তিনি মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যের সম্মুখিন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিলো বটে; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের প্রায় ৭০ জনের মৃতদেহ ছিলো চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করেছিলো। মুসলিম মুজাহিদরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও দুঃখ বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

(এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃক-কষ্ট ও বিষাদ।

(দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানেরা যেনো দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি যেনো অঙ্কুরেই মনোবল না হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ পাকের কোরআনে এ বাণী অবতীর্ণ হয় "তোমরা হতাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।"

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দরসের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেবার পর এখন আলোচ্য আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দুর্বলতা ও শিথলতাকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের কাজের জন্যেও মনমরা হয়ো না, আবসুস করো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাকো এবং আল্লাহর ওয়াদার উপর আস্থা রেখে রাসূর (সাঃ) এর আনুগত্য ও আল্লাহর পথে আন্দোলন ও জেহাদে অনড় থাকো, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।'

আয়াতে একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে সময় ও মনোবল নষ্ট না

www.pathagar.com

করে ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য চিন্তা করা দরকার। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস এবং রাসূলের আনুগত্যই হলো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো তোমরা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিও না। শেষ পর্যন্ত তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ ঘোষণা ওহুদের যুদ্ধে সাময়িক পরাজিত এবং বিপর্যস্ত সাহাবীদের ভাঙ্গা মনকে চাঙ্গা করে দিলো এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করলো। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা কিভাবে সাহাবায়ে কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের তরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীতের জয়-পরাজয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে বরং ভবিষ্যতে বাতিল শক্তির মোকাবেলার জন্য শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপায়-উপকরণ সংগ্রহে আত্ম নিয়োগ করা উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। তা হলো ঈমান ও তার দাবীসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য বৈষয়িক যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির মজবুতি, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণাদি দ্বারা সামর্থ অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

সুতরাং এসব আলোচনা থেকে একথাই প্রমানিত হয় যে, মুমিন ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে আঘাত জনিত কারণে অথবা সাময়িক পরাজয়ের কারণে অথবা বাতিল শক্তির সাময়িক বিজয়ের কারণে হতাশ হতে পারে না, মনভাঙ্গা হতে পারে না, দুঃখ করতে পারে না এবং ভয় ও ভীত সন্ত্রস্ত হতেও পারে না। এটা মোমিন জীবনের বৈশিষ্ট্যের খেলাফ কাজ। এরপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ط
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ “এখন যদি তোমাদের গায়ে আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে (বদরের যুদ্ধে) এমনি ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধী পক্ষের

www.pathagar.com

লোকদের গায়েও। এ-তো কালের উত্থান-পতন, আমি এসব মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করে থাকি।”

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছো ঠিকই, কিন্তু ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতিপক্ষও তো এ ধরনের দুর্ঘটনায় পড়েছে। ওহুদ যুদ্ধে তোমাদের প্রাণ প্রিয় নবী (সঃ) আহত হয়েছেন তোমরা নিজেরাও অনেকে আহত হয়েছো এবং তোমাদের ৭০ জন শহীদ হয়েছে। কিন্তু এক বছর আগে তাদেরও তো নেতা আবু জেহেল সহ ৭০ জন নিহত হয়ে জাহান্নামে চলে গেছে। তাদের অনেকে আহতও হয়েছিল। আর তোমরা তাদের ৭০ জনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলে। স্বয়ং (ওহুদ) যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। বিধায় তোমরাই যে শুধু কষ্ট পেয়েছো তা তো নয়। বরং এর চেয়েও বেশি তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং কষ্ট পেয়েছে।

তাছাড়া এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো ঃ আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরাম-আয়েশের দিনগুলোকে মানুষের মাঝে চক্রাকারে ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোনো কারনে কোনো মিথ্যা বা বাতিল শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সফল হয়ে যায়, তা হলে তাতে হক ও সত্যপন্থীদের হতোদ্যম ও নিরাশ হয়ে পড়া ঠিক নয় এবং এটা মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয় বরণই ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। বরং এ পরাজয় এবং বিফলতার সঠিক কারণ খোঁজ করার জন্য পর্যালোচনা করা উচিত এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেখা যাবে হক ও সত্য পন্থীরাই জয়যুক্ত হবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা বনি ইসরাইলে উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) দীর্ঘ ত্যাগ-তিতীক্ষার মাধ্যমে মক্কার বিজয়ের পর কাব্বা ঘরে রক্ষিত কাফেরদের দেবতা মূর্তিগুলোকে তার হাতের ছড়ি দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলতে ফেলতে বলছিলেন -

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

“সত্যের বিজয় হয়েছে এবং মিথ্যা বা বাতিলের বিদায় হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই। (বনী ইসরাঈল - ৮১)

www.pathagar.com

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط

অর্থাৎ "এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের উপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কে? আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে কবুল করতে চান।"

আয়াতের এই অংশে ওহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ের আরো দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। **প্রথম উদ্দেশ্য** ছিলো আল্লাহ তাআলা ওহুদের যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্যে প্রকৃত মুমিনদের বেছে নিতে চেয়েছিলেন। তার কারণ হলো মুসলমানদের সাথে মুসলমান নামধারী কিছু মুনাফেকদের সংমিশ্রন ছিলো। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই মধ্য পথ থেকেই আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইয়ের নেতৃত্বে তিনশত জন মুনাফিক কেটে পড়েছিলো, তার সাথে কিছু দুর্বল মুসলমানও ছিলো। ভবিষ্যতেও ইসলামের বিজয়ের জন্য আরও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হবে। কারা এসব ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারবে তার জন্য তিনি ওহুদের এই সাময়িক বিপর্যয় দিয়ে খাঁটি ঈমানদরদের বেছে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে কবুল করে শাহাদাতের মর্যাদা দান। যাতে করে পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর পথে জীবন দিতে পিছপা না হয়।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা (ওহুদের) এই পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদারদের পাক-সাফ করতে চান অর্থাৎ সাচ্চা মুমিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান।"

অত্র আয়াতের মাধ্যমে ওহুদের যুদ্ধের এই সাময়িক বিপর্যয় মুসলমানদের জন্য ছিলো একটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আরো একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। তা হলো এই ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিপর্যয়ের মাধ্যমে সাচ্চা এবং খাঁটি মুমিনদেরকে বাছাই করে নেয়া এবং এদের দ্বারাই ভবিষ্যতে কাফেরদেরকে চিরদিনের তরে নিশ্চিহ্ন করা।

www.pathagar.com

পরবর্তী মক্কা বিজয়ের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছিলো।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা সূরা আলে ইমরানের ১৩৯-১৪১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষা রয়েছে তা হলো -

● সাময়িক কোন পরাজয় বা বিফলতা, ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিপর্যয়ের জন্যে প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কোন সময়ের জন্যে হতাশ হবে না, মনোভাঙ্গা হয়ে পড়বে না এবং পরাজয়ের গ্লানির জন্য প্রলাপ বকবে না।

● অতীতের পরাজয়, বিফলতা এবং আঘাত পাবার জন্যে সামষ্টিক ভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক কারণ উৎঘাটন করা এবং তারই আলোকে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আরো দ্বিগুণ মনোবল এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে পূর্ণউদ্দমে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

● সাময়িক পরাজয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতকে আল্লাহ্ তাআলার একটা নীতি বলে মনে করতে হবে। এতে বোঝা যায় যে ইসলামী আন্দোলনে জয় পরাজয় স্বাভাবিক নিয়ম।

● কোনো প্রকার পরাজয় বা বিফলতাকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শাস্তি বা স্থায়ী পরাজয় মনে করা যাবে না। বরং একে ভবিষ্যতের সতর্কতার জন্য আল্লাহর পরীক্ষা বা সতর্কবাণী বলে মনে করতে হবে।

● ঈমানের অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

● শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্যে নিয়্যাত রাখতে হবে এবং আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে।

● এই আয়াতগুলোর পটভূমিতে বড় দুটি শিক্ষা পাওয়া যায় তাহলো ঃ

(১) বিশেষ করে মূল দায়িত্বশীলের মতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) নেতার আদেশকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। নিজেরা কিয়াস করে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। কিছু করতে হলে নেতার সাথে আলাপ করেই করতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে কোনো ভাবেই সাময়িক

www.pathagar.com

কৌশলের খেলাপ কাজ করা যাবে না। যার পরিণতিতে পরাজয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতের স্বীকার হতে না হয়।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, এ জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনো বাক্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আসুন আমরাও ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যত জীবনে ইসলামী আন্দোলনে মজবুত ঈমান, ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আন্দোলনের গতীকে আরো বেগবান করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কামনা কবুল করুন। আমিন। ওয়া খিরুদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

আট

সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যাদা

সূরা বাকারা ঃ ১৫৩-১৫৬ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ (১৫৩) ওহে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র কাছে) সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, (১৫৬) যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলেঃ "নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।"

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - হে বা ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اَمَنُوْا - ঈমান এনেছো। اسْتَعِيْنُوا - সাহায্য প্রার্থনা করো। بِ - সাথে, প্রতি। الصَّبْرِ - ধৈর্য। وَ - এবং। الصَّلٰوة - নামায। اِنَّ - নিশ্চয়। مَعَ - সাথে। الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলদের। لَا - না। تَقُوْلُوْا - তোমরা বলো। لِ - জন্য। مَنْ - যে। يُقْتَلُ - সে নিহত হয়। فِىْ - মধ্যে। سَبِيْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর পথে। اَمْوَاتٌ - মৃত। بَلْ - বরং। اَحْيَاءٌ - জীবিত। لٰكِنْ - কিন্তু। تَشْعُرُوْنَ - তোমরা বোঝ। لَنَبْلُوَنَّكُمْ - অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো। شَيْئٍ - কিছু। مِنْ - হতে। الْخَوْفِ - ভয়। الْجُوْعِ - ক্ষুধা। نَقْصٍ - ক্ষতি। الْاَمْوَالِ - সম্পদসমূহ। الْاَنْفُسِ - জানসমূহ। الثَّمَرٰت - ফল-ফসলসমূহ। بَشِّرْ - সুসংবাদ দাও। الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলরা। اَلَّذِيْنَ - যারা। اِذَا - যখন। اَصَابَتْهُمْ - তারা পড়ে বা পতিত হয়। مُصِيْبَةٌ - বিপদে। قَالُوْا - তারা বলে। اِنَّا - নিশ্চয়ই আমরা। لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য। اِلَيْهِ - তার দিকে। رٰجِعُوْنَ - আমরা ফিরে যাবো।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার মুমিন ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআন শরীফের সবচেয়ে বৃহত্তম সূরা সূরা বাকারার ১৯ তম রুকুর ১৫৩ থেকে ১৫৬ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের খেদমতে সঠিকভাবে এবং সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করার ক্ষমতা দান করেন। আমিন!

সূরার নামকরণ ঃ এ সূরার নাম "সূরাতুল বাকারা"। 'বাকারাহ' শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। এ সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতি গরু জবাই-এর নির্দেশ দিতে গিয়ে 'বাকারাহ' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় এই সূরার নাম "সূরাতুল বাকারাহ" রাখা হয়েছে। (নাম করণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য এক নম্বর দারসে দেখুন)

নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরতের পর মাদানী জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। অবশ্য এর কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে যেমন সুদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই সূরার সাথে যোগ করে দেয়া হয়েছে। আবার এই সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার ফলে এই সূরার সাথে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই ওহীর মাধ্যমে করা হয়েছে।

এই সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরাতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে বিধায় এই সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এটি কুরআন মজীদের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬ টি আয়াত রয়েছে।

বিষয়বস্তু ঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূল নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের পরিচয়, আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টির ইতিহাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাদের অকৃতজ্ঞতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ এ আয়াতগুলোতে জাতীয় দায়িত্বের সংকট মোকাবেলায় ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে মুমিনদের সাহায্য কামনার জন্য বলা হয়েছে। শহীদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর যখন মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হবে তখন তারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

পটভূমি ঃ (এই সূরার পটভূমি এক নম্বর দরসে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দেখুন) আলোচ্য আয়াতগুলো হিজরাতের ১৬ মাস পরে চূড়ান্তভাবে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পরেই অবতীর্ণ হয়।

www.pathagar.com

ব্যাখাঃ প্রিয় ভায়েরা, তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর এখন আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ এবং স্থায়ীভাবে কাবাকে কেবলা ঘোষণা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালনের এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যেসব করণীয় এ আয়াতে থেক তা উল্লেখ করে বলেন–

"হে মুমিন মুসলমানরা, তোমরা 'সবর' বা ধৈর্য এবং 'সালাত' বা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো।" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন এবং সব রকমের সমস্যা ও সংকটের মোকাবেলা দু'টি বিষয় দ্বারাই সম্ভব। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অপরটি 'সালাত' বা নামায।

এখানে اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটি বিশেষ কোনো একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় তা হলো এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার সমাধান দিতে পারে একমাত্র সবর ও নামায। মানুষ যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করতে পারে। (তাফসীরে মাযহারীতে দু'টির তাৎপর্য এভাবে করা হয়েছে।)

اَلصَّبْرِ 'সবর' শব্দের অর্থ ব্যাপক তবে এখানে যা নেয়া হয়েছে তা হলো সংযম অবলম্বন ও নফ্স বা প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে।

এক. নফস বা প্রবৃত্তিকে সব রকমের হারাম এবং নাজায়েয কাজ থেকে বিরত রাখা।

দুই. তাকে এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং

তিন. যে কোনো বিপদ-আপদে ও সংকটে ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ মানুষের চলার পথে যেসব বিপদ-আপদ এসে হাজির হয়, সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান পাবার আশা

www.pathagar.com

রাখা। অবশ্য কষ্টে বা বিপদে পড়ে মুখ দিয়ে যদি কোনো কাতর শব্দ বের হয়ে পড়ে বা অপরের কাছে তা প্রকাশ করা হয় তবে, তা 'সবর' এর পরিপন্থী হবে না। এটা স্বাভাবিক বিষয়। (ইবনে কাসীর সায়ীদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত)

প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য সবর সংক্রান্ত উপরের তিনটি বিষয় অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ লোকজনের ধারণা শুধু দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে পড়লেই সবর করতে হয়। প্রথম দু'টি বিষয় যে সবরের জন্য সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। এমনকি অনেকের জানাও নাই যে, প্রথম দু'টি সবরের মধ্যে গণ্য।

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সাবের বা ধৈর্যশীল সেসব লোককেই বলা হয়, যারা উপরের তিনটি বিষয়েই সবর করে। অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে সব রকরেমর হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে, আল্লাহর এবাদতে ও আনুগত্যে বাধ্য করবে এবং বিপদাপদে পড়লে বা সংকটে পড়লে ধৈর্য ধরবে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, ধৈর্যশীলরা কোথায়? একথা শোনার সাথে সাথে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা উপরের তিন প্রকারেই সবর করে দুনিয়ার জীবনকে কাটিয়েছে। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ইবনে কাসীর এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন– إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ "সবরকারী বান্দাদেরকে তাদের প্রতিদান বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে।" কুরআনের আলোচ্য এই আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

অতএব সবর এর তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় তা হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক সব রকমের হারাম এবং নাজায়েয কথা, কাজ এবং চিন্তা থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে দূরে রাখতে হবে। কেননা নফসের যে চাহিদা তা হলো দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার জন্য হালাল-হারামের কোনো বাচ-বিচার না করে ভোগ করা। নফসের এসব অবৈধ ও হারাম তাড়নাকে সবর বা ধৈর্যের মাধ্যমে রহিত করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাআলার যাবতীয় এবাদত বন্দেগী এবং রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে শয়তানের দ্বারা

www.pathagar.com

পরিচালিত প্রবৃত্তিকে সবর এর দ্বারা বাধ্য করতে হবে। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে এবং দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক থাকার কারণে অথবা জাতীয় দায়িত্ব পালনে যেসব বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ এবং সংকট দেখা দেবে তা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বলিষ্টতা ও সাহসিকতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

اَلصَّلٰوةَ সবর এর পর সালাত বা নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সব রকমের এবাদতই সবরের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এর পরও নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, নামায এমনই একটি এবাদত যার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং যাতে ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা পওয়া যায়। কেননা নামাযের মধ্যে যেমনি নফ্‌স তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য করা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, চিন্তা খেয়াল এমনকি অনেক হালাল বিষয় থেকেও দূরে রাখা হয়। যেমন নিজের 'নফস' এর উপর পরিপুর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সব রকমের গোনাহ ও অশোভনীয় আচার-আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবরের' যে প্রাক্‌টিস করতে হয় নামাযের মাধ্যমে তার একটা পুরোপুরি নমুনা ফুটে উঠে।

তাছাড়া সামাজিক এবং জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন যদি বান্দাহ্‌ নামাযে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে তার পেরেশানী লাঘব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের নবিজীর অভ্যাস ছিলো, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখনই তিনি কোনো সমস্যা বা সংকটে পড়ে পেরেশান হয়ে যেতেন তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর আল্লাহ্‌ তাআলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর সব রকমের বিপদাপদ এবং পেরেশানী দূর করে দিতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اِذَا حَزَنَهُ اَمَرَ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "মুহানবী (সাঃ) কে যখনই কোনো বিষয়ে চিন্তিত করে তুলতো তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।"

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অতঃপর আল্লাহ বলেনঃ "অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাআলা (এ ধরনের) সবরকারীদের সাথে আছন।" নামায এবং সবরের

www.pathagar.com

মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা এবং সংকটের প্রতিকার হবার কারণ এই যে, এ দু'টি পথেই সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বাক্যের দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারীদের সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে। আর এই যৌথ শক্তির কারণে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই টিকতে পারে না। বান্দাহ যখন আল্লাহর বলে বলিয়ান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার চলমান গতিকে ঠেকাবার মতো শক্তি আর কারো থাকে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো কিছুর উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং সমস্যা ও সংকট থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর বলে বলিয়ান হওয়া।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরানের শেষের আয়াতে বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং বাতিল শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও, হক প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তাহলে আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।" (আলে ইমরান ঃ ২০০)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুভব করো না।"

এই আয়াতে একথার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যুর কথা এবং তার চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে আতংক ও ভয়ের সৃষ্টি করে, এতে মানুষের মনের সাহস-হিম্মত দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয় তাদেরকে 'মৃত' বলতে মানা করা হয়েছে। কেননা তাতে ইসলামী দলের লোকজনের মধ্যে জেহাদী জায্বাহ এবং

www.pathagar.com

জীবনদান করার প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরিবর্তে এখানে একথা বলতে উপদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর পথে যে জীবন দেয়, সে মূলতঃ অক্ষয় ও চিরন্তন জীবন লাভ করে এ ধারণা মুমিনদের দেলে সুস্পষ্ট এবং জীবন্ত হয়ে থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলার শহীদদের বিশেষ এই মর্যাদার ঘোষণার কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে বীরত্ব ও নির্ভীকতার ভাবধারা অধিক থেকে অধিকতর তীব্র ও জীবন্ত হয়ে উঠে।

যারা আল্লাহর পথে নিহত বা শহীদ হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জীবিত বলে উল্লেখ করেছেন তার প্রমাণ উভয় জগত থেকেই পাওয়া যায়।

দুনিয়াতে অমর থাকে এভাবে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেবার ফলে তার সংগী-সাথীরা এবং পরবর্তী সময়ের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যুগ যুগ ধরে তার কথা স্মরণ করে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তার নাম চিরদিন জাতির লোকদের দেলে স্মরণ করার মাধ্যমে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা এভাবে তাকে জীবন্ত রাখেন।

আর আখেরাতের জীবনে আলমে বরযখ বা কবরের জগতে সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদদের বেশী অনুভুতি ক্ষমতা দেয়া হয়। এমনকি শহীদদের এ জীবনের অনুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাদের জড় দেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে নষ্ট করতে পারে না। জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে।

মোট কথা, কবরের এ জীবনে সবচেয়ে বেশী শক্তিমান হবেন নবী রাসূলগণ তারপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তিগণ।

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের কবরের জীবন সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, আর তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রেজেক পেয়ে থাকে। (আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

একটি বিষয় জানা প্রয়োজন তা হলো যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হতে দেখা যায়, তবে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে কিন্তু তার নিয়্যাত ঠিক ছিলো না বলে তার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু হয়নি। কেননা শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হয় না তা নয়। অনেক সময় জমিনের অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো প্রভাবেও জড়দেহ নষ্ট হতে পারে। নবী-রাসূর এবং শহীদদের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বোঝায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও নষ্ট হতে পারে না।

وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ "কিন্তু তোমরা শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বোঝতে পারো না।" যেহেতু বরযখ বা কবরের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না সেহেতু কুরআনে শহীদদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ (তোমরা বুঝতে পারো না। বলা হয়েছে। এ কথার সারমর্ম হলো এই যে, শহীদের সে কবরের জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে বরযখ বা কবরের অবস্থা মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া আর সব প্রাণী বুঝতে পারে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ـ

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার চিরা-চরিত নিয়মানুযায়ী মুমিনদের ঈমান পরীক্ষার জন্য তার নীতি হিসেবে বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে (দুষমনের) কিছু কিছু ভয় দেখিয়ে, ক্ষুধা-অনাহার এবং জান মালের ক্ষতি করে এবং ফল-ফসলের উৎপাদন কম এবং আমদানীর ঘাটতি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবো। প্রকৃতপক্ষে মানুষ দুনিয়াতে যেসব জিনিসকে বেশী মহব্বত করে থাকে সেসব জিনিসের ক্ষতি ঘটাবেন একমাত্র ঈমানের পরীক্ষার জন্য। কারা কারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ধৈর্য ধারণ করে তা দেখার জন্য। আল্লাহ্র তো এটা ইচ্ছা নয় যে বান্দাহর খামাখা ক্ষতি করা। আল্লাহ তো বান্দাহ্কে কঠিন আযাব থেকে নাযাত দিতে চান। আর নাযাতের প্রকৃত পথই হলো মজবুত অবিচল ঈমান এবং জেহাদী জিন্দেগী।

www.pathagar.com

আর যখনই কোনো বান্দাহ্ ঈমানের উপর দৃঢ় থেকে আল্লাহ্‌র দ্বীন পতিষ্ঠার জেহাদে আত্মনিয়োগ করবে তখনই তাদেরকে এসবের ক্ষতি এবং ঝুকির সম্মুখীন হতে হবে। আর এক্ষতি এবং ঝুকি থেকে বাঁচার উপায় হলো সবর বা ধৈর্য।

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ যারা এসব ক্ষতি এবং ঝুকি নিতে প্রস্তুত থাকবে আল্লাহ্ তাআলা এসব অবিচল সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল লোকদেরকে এই বাক্য দ্বারা সুসংবাদ দানের কথা বলেছেন। এ সুসংবাদ হলো দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র দিদার লাভের মাধ্যমে জান্নাত লাভ।

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

"এসব সুসংবাদ এমন সব ধৈর্যশীলদের জন্য যখন তাদের সামনে কোনো বিপদ আসে বা বিপদ-মুসিবতে পড়ে তখন তারা বলে উঠে আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আমাদেরকে আল্লাহ্‌রই কাছে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে।"

এখানে 'বলা' অর্থ কেবল মুখে একথা ও শব্দগুলো উচ্চরণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং মনের গভীর কোন হতে অনুভব করতে হবে যে, প্রকৃত পক্ষে আমরা আল্লাহ্‌রই বান্দাহ্। এজন্য আল্লাহ্‌র পথে আমাদের যেসব জিনিসের কোরবানী করা হয়েছে; তা সঠিক খাতেই ব্যয় হয়েছে বলে মনে করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যার জিনিস, তারই কাজে– তারই জন্য নিযুক্ত ও ব্যয় হয়েছে এবং এটাও অনুভব করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরকেও ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আমরা চিরদিন থাকবো না, আজ হোক কালা হোক শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ বলেন– ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ "অতঃপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।"

সুতরাং তাঁরই কাজে এবং তাঁরই পথে জীবনদান করে তাঁর কাছে হাজির হওয়াটাই কি আমাদের জন্য উচিত নয়? আমরা যদি নিজেদের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হই এবং এ অবস্থায় মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়েই কোনো রোগ বা হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তবে তার চেয়ে আল্লাহর পথে প্রাণ দেওয়াটাই অনেক অনেক উত্তম।

www.pathagar.com

তাছাড়া এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা যেমন অন্তরের অনুভূতিতে একথাকে স্মরণ করে তেমনিভাবে যখনই তারা কোনো বিপদাপদ এবং দুঃখ কষ্টে পড়ে তখনই তারা বলে উঠে "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।" এতে যেমন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় তেমনিভাবে মনের মধ্যে সবরও এসে যায় এবং সওয়াবও পাওয়া যায়।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা, আলোচ্য দারস থেকে আমাদের জন্যে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

* সামাজিক এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কুরআনের আইন বিরোধী লোকদের দ্বারা যত প্রকারের বাধা-বিপত্তি আসুক না কেনো তা ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

* ইসলাম অনুসরণ এবং ইসলামী আন্দোলন করার কারণে পারিবারিক, সামাজিক, এবং জাতীয়ভাবে অথবা বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত প্রকারের পরীক্ষা আসুক না কেনো তা সবর বা ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

* সামাজিকওজাতীয় দায়িত্ব পালন বা ইসলামী আন্দোলন করার জন্য কোনো সমস্যা বা সংকটে পড়ে পেরেশানী দেখা দিলে ওযু করে নফল নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ্কে হাজির-নাজির জেনে বিনয়ের সাথে নামায পড়তে হবে।

* আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য শাহাদাতের মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখে সদা-সর্বদা শহীদ হবার তামান্না মনের মধ্যে রাখতে হবে। তাহলে দেলে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর দুনিয়ার কোনো কিছুর ভয় থাকবে না।

* সামাজিক এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মী কিনা তার জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি, জান-মালের ক্ষতি, ফল-ফসলের উৎপাদন বা আমদানী হ্রাস ঘটার মাধ্যমে পরীক্ষা আসলে আখেরাতের নাজাতের আশায় চরমভাবে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

* মৃত্যুর পর সকলকেই যেহেতু আল্লাহ্র দরবারে ফিরে যেতে হবে এজন্য মৃত্যুর ভয় না করে আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েই আল্লাহ্র দরবারে হাজির

www.pathagar.com

হবার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে শহীদের মৃত্যু কামনা করতে হবে।

* কোনো বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট বা কোন কিছুর ক্ষতি হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে সাথে সাথে "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়তে হবে।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা বাকারার যে কয়েকটি আয়াতের দারস আপনাদের সামনে পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আমাদের সামাজিক, জাতীয় এবং আন্দোলনী জীবনে যত প্রকারের বাধা বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা এবং সংকট দেখা দেক না কেনো তা সবর এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবেলা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আর শাহাদাতের মৃত্যুর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথেই নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য সবাইকে আবারও আহ্বান জানিয়ে আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

[সালাম দিয়ে শেষ করবেন।]

www.pathagar.com

নয়

মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ ঃ

সূরা মুনাফিকুন ৯-১১ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ○ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ○ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়ে যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (১০) আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকেই মরণ আসার আগেই ব্যয় করো। নতুবা (যখন মরণ এসে যাবে তখন) সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমাকে আরও একটু সময় দিলে না কেনো? তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম এবং নেককার লোকদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম। (১১) অথচ যখন কোনো ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময় হাজির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ কাউকে (বাঁচার) অবকাশ বা সুযোগ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সব বিষয়ে খুব খবর রাখেন।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - হে, ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো। لَا - না। تُلْهِكُمْ - তোমাদের গাফেল করে। اَمْوَالُكُمْ - তোমাদের সম্পদ। وَ - ও। اَوْلَادُكُمْ - তোমাদের সন্তানেরা। عَنْ - থেকে। ذِكْرِ اللّٰهِ - আল্লাহর স্মরণ। مَنْ - যে। يَفْعَلْ - তোমরা করবে। ذٰلِكَ - এটা বা ওটা। فَ - অতঃপর। اُولٰئِكَ - ঐসব (লোক)। هُمْ - তারাই। الْخٰسِرُوْنَ - ক্ষতিগ্রস্ত। اَنْفِقُوْا - তোমরা খরচ করো। مِنْ - থেকে। مَا - তা বা যা। رَزَقْنٰكُمْ - আমরা তোমাদের রিজিক দিয়েছি। قبل - পূর্বে। ان - যে। يَّاتِىَ - আসে। اَحَدَكُمْ - তোমাদের কারও। الْمَوْتُ - মৃত্যু। فَيَقُوْلَ - অতঃপর সে বলবে। رَبِّ - আমার প্রভু। لَوْ - কেনো। اَخَّرْتَنِىْ - আমাকে অবকাশ দিলে। اِلٰى - দিকে, পর্যন্ত। اَجَلٍ - কাল, সময়। قَرِيْبٍ - কিছু, নিকট। فَاَصَّدَّقَ - তাহলে আমি সাদকা করতাম। اَكُنْ - আমি হতাম। مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত। وَ - অথচ। لَنْ - কক্ষণ না। يُّؤَخِّرَ - অবকাশ দেন। نَفْسًا - কোন ব্যক্তিকে। اِذَا - যখন। جَاءَ - আসে। اَجَلُهَا - তার নির্ধারিত সময়। وَ - আর। خَبِيْرٌ - খবর রাখেন। بِمَا - যা কিছু। تَعْمَلُوْنَ - তোমরা কাজ করো।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি এই মাহফিলে/ মজলিসে/ বৈঠকে দারসুল কুরআন পেশ করার জন্য সূরা মুনাফিকুন এর ২য় রুকুর ৯-১১ মোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত এবং বাংলা অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে সহিহ সালামতে দারস পেশ করার এবং ধৈর্য ধরে শোনার তাওফীক দান করুন। আমিন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার প্রথম আয়াত اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ উল্লেখিত الْمُنٰفِقُوْنَ শব্দ হতেই এই সূরার নাম 'মুনাফিকুন' করা হয়েছে। এই সূরাটি নামকরণ কুরআনের অন্যান্য সূরা

www.pathagar.com

থেকে আলাদা। কেননা এই সূরার বিষয় বস্তুই হলো মুনাফিকদের আচরণ ও কাজ কামের সমালোচনা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে। কাজেই এই সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময় কাল ঃ সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রাসূলে কারীম (সাঃ) এর ফিরার পথে অথবা মদীনায় পৌঁছে যাবার পর পরই এই সূরা নাযিল হয়। ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। গোটা সূরাটি একই সময় অবতীর্ণ হয়েছিলো।

সূরাটির আলোচ্য বিষয়বস্তু ঃ সূরাটিতে মূলত মুনাফিকদের আচার-আচরণ এবং তাদের কার্য-কলাপের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পটভূমি বা সূরাটি অবতরণের কারণ ঃ সূরাটি নাযিল সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। এই ঘটনাটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। (মাযহারী)

ঘটনাটি ছিলো এই ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সর্দার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। (এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁর পিতা ছিলেন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যান।)

সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম (সাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা দেন। এই জেহাদে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই সহ একদল মোনাফেক গাণিমাতের মালের ভাগীদার হবার লোভে অংশ নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাঁর দলবলসহ মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে পরিচিত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষের মোকাবেলা হলো। এতে মুস্তালিক গোত্রের বহুলোক নিহত

www.pathagar.com

এবং আহত হলো এবং বাকীরা পালাতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এ যুদ্ধে বিজয় করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ গাণিমাত হিসেবে লাভ করলেন এবং কিছু পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। এভাবে এ জেহাদ শেষ হলো।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই অবস্থান করছিলো, তখন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলো। একজন মুহাজির (হিজরাতকারী) ও একজন আনসারীর (সাহায্যকারী) মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো। এতে মুহাজির জাহ্জাহ্ ইবনে মাসউদ গিফারী সাহায্যের জন্য মুহাজিরদের ডাকলো এবং আনসারী সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী আনসারদেরকে ডাক দিলো। উভয়ের সাহায্যের জন্য কিছু লোক এগিয়ে গেলো। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন এবং ভীষণভাবে রেগে গিয়ে বললেন ঃ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ। "একি জাহেলী যুগের ডাক"! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে পুঁজি করে সাহায্য ও সহযোগীতার আয়োজন হচ্ছে কেনো? তিনি আরও বললেন دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ এই (জাহেলী) স্লোগান বন্ধ করো। এটা পচা স্লোগান।' তিনি বললেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা- সে যালেম হোক অথবা মজলুম হোক। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ হলো জুলুম করা থেকে বাধা দেয়া। আর মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ হলো, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা। আর এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম আর কে মজলুম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেপে ধরা- সে নিজের ভাই হোক অথবা নিজের বাপ হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা জাহেলিয়াতের পচা স্লোগান। এর প্রতিফল [illegible] বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই হয় না।

রাসূলের এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেলো। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহজাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হলো। তার লাথির আঘাতে

www.pathagar.com

আনসারী সিনান আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী যালেম ও মযলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেলো।

মুনাফিকদের যে দলটি গাণিমাতের মালের ভাগ পাবার লোভে মুসলমানদের সাথে এসেছিলো। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেলো, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে ফাটোল ধরাবার একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিলো। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবলমাত্র যায়েদ ইবনে আকরাম উপস্থিত ছিলেন। আনসারদেরকে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বললো ঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে নিজের দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছো। নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছো। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত-পালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মট্কাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের দায়িত্ব হলো, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে অসম্মানী লোকদেরকে বের করে দেবে।

সম্মানী বলে বুঝাচ্ছিলো তার নিজের মুনাফিক দল ও আনসারদেরকে এবং বাজে এবং অসম্মানী লোক বলে বুঝাচ্ছিলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামদের। হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন ঃ আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজে অসম্মানিত ও ঘৃণিত লোক। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই আল্লাহর শক্তির বলে এবং মুসলমানদের ভালোবাসার জোরে মহাসম্মানী।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিলো যে, বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু হযরত যায়েদের রাগ দেখে তার হুঁস ফিরে এলো। পাছে তার মনের কুফরী ফাঁস হয়ে না পড়ে, এই ভয়ে সে হযরত যায়েদের কাছে ওজর পেশ করে বললো ঃ আমি তো একথাটা হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার উদ্দেশ্য ছিলো না।

www.pathagar.com

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) মুনাফিকদের মজলিশ থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে দিলেন। রাসূলের কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হলো। তার চেহারার পরিবর্তন দেখা দিলো। যায়েদ ইবনে আকরাম বয়সে ছোট থাকায় রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন? ছেলে দেখো, তুমি আবার মিথ্যা বলছো না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন ঃ না, (হুজুর) আমি মিথ্যা বলছি না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রাসূর (সাঃ) আবারও জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কোনো রকম বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে আগের কথাই বললেন। এরপর মোনাফিক সর্দারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোনো আলোচনাই রইলো না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) কে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমি নিজের জাতির নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছো। এতে যায়েদ (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, গোটা খায়রাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া আর কেউ প্রিয় নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার বাপও এমন কথা বলতো তবে, আমি তাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলে দিতাম।

অপর দিকে হযরত ওমর (রাঃ) ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলের কাছে এসে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অন্য বর্ণনায় আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন ঃ অপনি আমাকে অনুমতি না দিলে ওব্বাদ ইবনে বিশরকে নির্দেশ দেন, সে তার মাথা কেটে আপনার সামনে নিয়ে হাজির করুক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার একথায় বললেন ঃ ওমর এটা হয় না। এতে লোকেরা বলবে, দেখো! মুহাম্মদ নিজেই তার সঙ্গী সাথীদের হত্যা করছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তার নামও আব্দুল্লাহ ছিলো। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

www.pathagar.com

যদি আপনি আমার বাপকে এসব আপত্তিকর কথাবার্তার জন্য হত্যা করার ইচ্ছা রাখেন, তাহলে আমাকেই আদেশ করুন, আমি তার মাথা কেটে আপনার কাছে এই মজলিশ ত্যাগ করার আগেই হাজির করে দেবো। তিনি আরও বললেন ঃ গোটা খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের কেউ আমার চেয়ে বেশী বাপ-মার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোনো বিষয় সহ্য করতে পারবো না। আমার ভয় যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার বাপকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার বাপের হত্যাকারীকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে হয়তো আত্মসম্বরণ করতে পারবো না। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ(হে আবদুল্লাহ) তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রাসূলের সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ে সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উটের পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে একাকী ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছো? সে অনেক কসম খেয়ে বললো ঃ আমি কখনও এমন কথা বলিনি। এই ছেলেটি মিথ্যা বলেছে, মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযরকে গ্রহণ করে নিলেন। জনগণের মধ্যে (রাসুলকে অভিযোগকারী) যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও তিরস্কার আরও বেড়ে গেলো। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সারাদিন ও সারারাত বিরতিহীন ভাবে সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও একটানা সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যের তেজ বাড়তে লাগলো, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পুরো একদিন একরাত একটানা সফরের ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনজিলে অবস্থানের সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক অসময়ে সফর করা এবং দীর্ঘ সময় সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনায় উদ্ভুত জল্পনা-কল্পনা থেকে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ বিষয়ে চর্চার সুযোগ না পায়।

এরপর রাসূলূল্লাহ (সাঃ) (মদীনার পথে) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশ দিলেন ঃ তুমি এক কাজ করো। রাসূলের কাছে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শোনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে হযরত ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমার এই অবজ্ঞা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) বার বার রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা জাতির চোখে হেয় করেছে। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই লোকের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে। এমতাবস্থায় হঠাৎ যায়েদ দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের আলামত ফুটে উঠেছে। যায়েদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোনো ওহী নাযিল হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর এই অবস্থা দূর হয়ে গেলো। যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রাসূলূল্লাহ (সাঃ) এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিলো। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরে বললেনঃ

يَاغُلَامُ صَدَقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ وَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْمُنَافِقِيْنَ فِىْ اِبْنِ اَبِىْ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا ـ

অর্থাৎ "হে বালক, আল্লাহ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবন উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

এই বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বগভী (রঃ) এর বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌছে যান এবং যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) অপমানের ভয়ে

www.pathagar.com

বাড়িতে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল হয়েছে। সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি বা কারণ এতটুকুই।

ব্যাখ্যা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেনো আল্লাহর স্মরন থেকে গাফেল করে না দেয়।"

এই সূরার প্রথম রুকুতে মুনাফিকদের মিথ্যা কসম ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বতে জড়িত হওয়াই ছিলো এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে সুযোগ সুবিধা এবং গাণিমাতের মালের ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে বাহ্যিক ভাবে মুসলমান বলে জাহির করতো। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে আনসারদের পক্ষ থেকে ব্যয় বা খরচ করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত মুনাফিকরা করেছিলো, এর পেছনেও এ কারণই নিহিত ছিলো।

এই দ্বিতীয় রুকুতে মুনাফিক মিশ্রিত মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের মতো দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে যেয়ো না। যেসব জিনিস মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, যে সবের স্বার্থেই ঈমানের দাবী পূরণ, দায়িত্ব পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে মুনাফেকী এবং ঈমানের দুর্বলতা কিংবা ফাসেকী বা নাফরমানী কাজে জড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে দুটি জিনিষ সবচেয়ে বেশী কাজ করে, তা হলো- (১) ধন-সম্পদ এবং (২) সন্তান-সন্ততি। তাই এই আয়াতে এ দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা তাগাবুনে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিকে ফিতনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন ঃ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ। (তাগাবুন-১৫)

www.pathagar.com

মূলত আল্লাহকে ভুলে যাওয়া বা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া সকল প্রকার অন্যায় কাজের মূল কারণ। মানুষ মোটেও স্বাধীন নয়, এক আল্লাহ্র বান্দাহ, আর আল্লাহ্ তার কাজ কাম পুরোপুরি জানেন এবং একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ-কামের খুঁটিনাটি হিসাব দিতে হবে, এ কথা যদি মানুষের মনে থাকে ভুলে না যায়, তা হলে কোনো প্রকার গুমরাহী বা পাপ কাজে জড়িয়ে পড়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনও যদি পদস্খলন ঘটে যায় তবে হুঁস ফেরার সাথে সাথে সে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, ফলে ভুল পথ পরিহার করে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয় জরুরী হয়ে যায়। তবে সর্বদা এই সীমানার দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, এসব জিনিষ যেনো মানুষকে আল্লাহ্র জিকির (স্মরন) থেকে গাফেল বা ভুলিয়ে না দেয়। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণের' অর্থ কোনো কোনো তাফসীরবিদদের মতে পাঁচওয়াক্ত নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে আল-কুরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত বন্দেগী। এই অর্থ সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। (কুরতুবী)

প্রিয় ভায়েরা আল্লাহ্ তাআলার এই বক্তব্যের সাথে আমাদের জীবনকে একটু মিলিয়ে দেখি। আমরা কি প্রকৃত খাটি ঈমানদার না দুনিয়ার স্বার্থবাজ মুনাফিক মুসলমান। বর্তমানে আমরা নিজেকে ঈমানদার মুমিন মুসলমান হিসেবে জাহির করলেও আমরা এ দু'টো জিনিস ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ী গড়ার কাজে এতো ব্যস্ত যে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমতো দূরের কথা চিন্তা করারও সুযোগ পাই না। দ্বীন ইসলামের ধার-ধারীনা। নিজের সন্তান-সন্ততিদের মহব্বতে এতো পেরেশান যে তাদেরকে কিভাবে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে, তাতে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক থাক বা না থাক তার চিন্তা করি না। সন্তানদের সুখ শান্তির জন্য সদাসর্বদা উদগ্রীব থাকি। কিন্তু আল্লাহ্র বিধান মানার ব্যাপারে থোড়াই তোয়াক্কা করি। তাহলে কি আমাদের আচার-আচারণ কাজ কাম

তথাকথিত ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের আচর-আচরণ কাজ কামের সাথে মিলে যাচ্ছে না? একটু ভেবে দেখুন!

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

আর যাদের আচার-আচরণ এবং কাজ-কাম এমন হবে বা যারা দুনিয়াই ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির মহব্বতে আল্লাহকে ভুলে যাবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।' যারা দুনিয়ার এসব জিনিসের মহব্বতে ডুবে যাবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহকে ভুলে যাবে, আখেরাতের স্মরণ থাকবে না। তবে দুনিয়ার স্বার্থের জন্য নিজেকে মুসলমানের কাতারে রাখবে। আর এর পরিণতি তো মুনাফিকদের মতই হবে। আখেরাতের চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের (আখেরাতে) অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। (নিসা-১৪৫)

আয়াতে خٰسِرُوْنَ বলতে আখেরাতের এই চরম ক্ষতি জাহান্নামের কথায় বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -

"আমি তোমাদের যে রুযি দিয়েছে, তা থেকে মরণের আগেই ব্যয় করো।" এই আয়াতে মরণ আসা মানে মরণের আলামত দেখা দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মরণের আলামত সামনে আসার আগেই শরীর সুস্থ্য এবং গায়ে বল থাকা অবস্থায় তোমাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নাহলে মরার পর এই ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।

আগের আয়াতে আল্লাহর স্মরণের' মানে করা হয়েছে যাবতীয় এবাদত বন্দেগী এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর মধ্যে গণ্য ছিলো। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার দুটো কারণ হতে পারে।

www.pathagar.com

(এক) আল্লাহ এবং তার আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে ভুলিয়ে এবং দূরে রাখার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্জ ইত্যাদি আর্থিক এবাদত আলাদাভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।

(দুই) মরার আলামত দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাজগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্জ আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে। কিন্তু ধন-সম্পদ টাকা পয়সা সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন বা অর্থ তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনই তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ খরচ করে আর্থিক এবাদতের দোষ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে।

হাদীসে "হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোন সদকায় বা দানে সবচেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ "যে সদকা বা দান সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল করে অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই গরীব হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় করা হয়।" তিনি (রাসূল সাঃ) আরও বললেন ঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত দেরী করো না যখন জান তোমার গলার কাছে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাকো আর বলো ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় করো।" (বুখারী, মুসলিম)

অথচ দুনিয়াতে দেখা যায় মানুষ ধন-সম্পদ এবং অঢেল প্রাচুর্যের আশায় কবরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত মশগুল থাকে। আল্লাহ সূরা তাকাসূরে বলেন ঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

অর্থাৎ "প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এমন গাফেল রাখে যে, তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও অর্থাৎ তোমাদের মরণ এসে যায়। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর কাজে সময় দিতে পার না এবং তার পথে অর্থ-সম্পদ খরচ করারও সুযোগ করে উঠতে পারো না।

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

www.pathagar.com

"অতপর সে বলে ঃ হে আমার রব, আমাকে আরও কিছু সময় সুযোগ দিলে না কেনো? তাহলে আমি দান সদকা করতাম এবং নেক বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তির যাকাত ফরজ ছিলো, কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ ফরয ছিলো কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই, অর্থাৎ, আমার মরণ আরও দেরীতে আসুক, যাতে আমি দান-সদকাহ্ করে নিতে পারি এবং ফরয কাজ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারি।

وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ "আর কিছু সময় পেলে এমন সব ভাল নেক কাজ-কাম করে নেব, যার দ্বারা আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। যেসব ফরয কাজ বাদ পড়েছে, সেগুলো পুরা করে নেবো এবং যেসব হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ-কাম করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেবো। কিন্তু এর প্রতি উত্তরে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ঃ-

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ـ

অর্থাৎ "যখন প্রত্যেক ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্দ্ধারিত সময় হাজির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ কাউকেও (মরণের হাত থেকে) রেহায় দেন না।"

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার এটা নীতি নয় যে, তার জন্য যে মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে তার এদিক ওদিক করা। তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেলে অবশ্যই তাকে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। সুতরাং তোমাদের এই যে বাসনা এটা নিরর্থক, তোমাদের এই বাসনা পূরণ করার কোনো সুযোগ আমার কাছে নেই।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যা যা করো আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে খবর রাখেন। (অর্থাৎ তোমাদের মুনাফিকী যে আচরণ এটা অন্যরা না জানলেও আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের মনের খবর খুব ভালো করেই জানি। তোমরা মুসলমানদের সাথে দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য তাল মিলিয়ে চলো, কিন্তু তোমরা মনের মধ্যে ভিন্ন চিন্তা করো। তোমাদের মনে এক, কাজে আরাক এসব বিষয়ের খবর আর কেউ

www.pathagar.com

না জানলেও আমি আল্লাহ্ ভাল ভাবেই খবর রাখি। তোমাদের এসব কামনা বাসনা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা সূরা মুাফিকুনের ২য় রুকুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ-

● মুনাফিকী ঈমান পরিহার করে খাঁটি নির্ভেজাল ঈমানদার হতে হবে। কাজের সাথে মনের নিয়্যাতের মিল থাকতে হবে।

● দুনিয়ায় স্বাভাবিকভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হালাল উপয়ে ধন-সম্পদ কামায়ের চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রাচুর্য গড়ার জন্য আল্লাহর স্মরণ অর্থাৎ, তার আইন-কানুন বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করেহালাল-হারামের বাচ-বিচার না করে ধন-সম্পদের পেছনে ছুটে দুনিয়াদারীতে ডুবে যাওয়া যাবে না।

● নিজের সন্তান-সন্ততিকে মহব্বত করা যাবে। কিন্তু সন্তান-সন্তুতির মহব্বতের জন্য আল্লাহর মহব্বতকে ত্যাগ করা যাবে না। ছেলেকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার যে মানষিকতা তা পরিহার করতে হবে।

● যা কিছু করতে হবে মরণের আগেই আল্লাহকে পাবার জন্য করতে হবে। এ জন্য যতটুকু আল্লাহ রুযি-রেজেক দিয়েছেন তার থেকেই আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে। একথা বলা যাবে না যে আল্লাহ্ আমাকে যখন বেশী ধন-সম্পদ দেবেন তখনই ব্যয় করবো।

● মরণ আসার পূর্বেই অর্থাৎ অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং বৃদ্ধ হবার আগে যৌবনকালকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী, তার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং মানার মাধ্যমে নেক বান্দাহ্ হতে হবে।

● আল্লাহর স্মরণ থেকে কোনো সময়ে গাফেল না হবার জন্য সব সময় মরণকে স্মরণ রাখতে হবে।

আহ্বানঃ সম্মানিত ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মুনাফিকুনের দ্বিতীয় রুকু থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার জ্ঞানের বাইরে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর মুনাফিকী আচরণ পরিহার করে মরণের আগেই বয়স থাকতেই দুনিয়াতে ডুবে না গিয়ে আল্লাহর পথে খরচ, সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হবার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন। (অতঃপর সালাম দিয়ে শেষ করবেন)।

www.pathagar.com

দশ

কিয়ামতের দৃশ্য

সূরা হজ্ব ঃ ১-২ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে– (১) ওহে লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটা ভয়ংকর ব্যাপার। (২) সেদিন তোমরা দেখবে যে, প্রত্যেক দুধ দানকারিণী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা প্রকৃত মাতাল নয়। বরং (সেদিনের) আল্লাহর আযাব হবে খুব কঠিন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يٰاَيُّهَا – ওহে, হে। النَّاسُ – মানুষ। اِتَّقُوْا – তোমরা ভয় করো। رَبَّكُمْ – তোমাদের প্রভু, প্রতিপালককে। اِنَّ – নিশ্চয়। زَلْزَلَةَ – প্রকম্পন। السَّاعَةِ – কিয়ামত। شَيْءٌ – জিনিস, বিষয়, ব্যাপার। عَظِيْمٌ – বড়, ভয়ংকর। يَوْمَ – দিন। تَرَوْنَهَا – তোমরা তা দেখবে, প্রত্যক্ষ করবে। تَذْهَلُ – ভুলে যাবে।

www.pathagar.com

كُلُّ - প্রত্যেক। مُرْضِعَةٍ - দুধ দানকারিণী। اَرْضَعَتْ - দুধপানকারী শিশু। وَ - এবং। تَضَعُ - গর্ভপাত করবে। حَمْلٍ - গর্ভবতী। حَمْلَهَا - তার গর্ভের বোঝা, (সন্তান)। تَرَى النَّاسَ - তুমি মানুষকে দেখবে। سُكٰرٰى - নেশাগ্রস্ত, মাতাল। مَا - নয়। هُمْ - তারা। لٰكِنَّ - বরং, বস্তুতঃ। عَذَابٌ - শাস্তি। شَدِيْدٌ - কঠিন, শক্ত, ভয়ঙ্কর।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ইসলামপ্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা /বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম থেকে দারস পেশ করার জন্য সূরা হজ্ব এর ১ ও ২নং আয়াত দু'টি তিলাওয়াত ও অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে সঠিকভাবে এবং সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন! অমা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ্। (দারস দেবার সময় এভাবে বলবেন।)

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ "হজ্জ পালনের জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানাও"- এর 'আল-হজ্ব' শব্দটিকে সূরার পরিচিতির জন্য নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরাটিকে এককভাবে মাক্কীও বলা যায় না আবার মাদানীও বলা যায় না। এতে উভয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। এই সূরা মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। মনে হয় এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গিতে মাক্কী মাদানী উভয় লক্ষণ দেখা যাবার কারণ এই যে, মাক্কী জীবনের শেষের দিকে সূরার ১ম অংশটি অবতীর্ণ হয় এবং শেষের অংশটি অর্থাৎ ২৫ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে এই সূরার মধ্যে উভয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিধায় সূরাটি মিশ্র।

সূরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন ঃ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু বাড়ীতে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায়

www.pathagar.com

ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত 'নাসেখ' (রহিতকারী), কিছু 'মানসুখ' (রহিত) এবং কিছু মুহকাম (সুস্পষ্ট) ও কিছু 'মুতাশাবিহ্' (অস্পষ্ট)। সূরাটি নাযিলের সব রকমের বৈশিষ্ট্যই সন্নিবেশিত রয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ এই সূরার প্রথমে মানুষকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুল ধরা হয়েছে। সূরায় মক্কার মুশরিক, দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহ প্রবণ মুসলমান এবং খাঁটি ও সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলমান এই তিন শ্রেণীর লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকদেরকে শক্ত ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে জাহেলী চিন্তা পরিহার করে, মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন বন্ধ করতে বলা হয়েছে। শিরকের বিরুদ্ধে, তাওহীদ ও পরকালের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহপ্রবণ মুসলমানদেরকে ঈমান গ্রহণ করার পর ঝুকি না নেবার জন্য কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন বিপদ-আপদ আসলে তা তোমরা কিছুতেই এড়াতে পারবে না বলা হয়েছে।

ঈমানদার লোকদেরকে দু ধরনের কথা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এক ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এবং আরব দেশের জনমতকে উদ্দেশ্য করে। আর অপর ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে।

এই সূরায় মুসলমানদেরকে কুরাইশদের অত্যাচার যুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অর্থাৎ যুদ্ধের প্রাথমিক অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং নিজেদের জীবনকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা, তেলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির প্রাথমিক ধারণা দেবার পর এখন প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

"ওহে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন বড় (ভয়াবহ) ব্যাপার।

www.pathagar.com

এই আয়াতটি সফরের অবস্থায় রাসূল (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম) এখানে গোটা মানব জাতিকে কিয়ামতের সেই কঠিন ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কিয়ামতের এই زَلْزَلَةَ প্রকম্পন কিয়ামতের শুরুতে হবে না মানুষের পুনরুত্থিত হবার পর ভূকম্পন হবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে এটা কিয়ামতের শুরুতে যে কম্পন সেটাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ভূকম্পন পুনরুত্থান ও হাশরের পর হবে। উভয়ের মতের পক্ষে হাদীসও রয়েছে। কিন্তু প্রথম মতের পক্ষে হাদীসও যেমন রয়েছে তেমনিভাবে এর সপক্ষে কুরআনে আরো অন্যান্য সূরায় বর্ণিত অনেক সামঞ্জস্যপুর্ণ আয়াত রয়েছে। আমি আলোচ্য আয়াতের' প্রকম্পন'কে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার ভূকম্পন হিসেবে ধরে নিয়ে এর একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরছি।

শিংগায় ফূঁক তিনবার দেয়া হবে ঃ হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিয়ামতের যে দৃশ্য তুলে ধরেছেন সেখানে বলা হয়েছে– শিংগা ফুঁক দেবার তিনটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে ঃ

প্রথম ফুঁক ঃ 'নফ্খে কাযা' অর্থাৎ বিভীষিকা সৃষ্টিকারী ফুঁক;

দ্বিতীয় ফুঁক ঃ 'নফ্খে সায়াক' অর্থাৎ বিপর্যয়ের ফুঁক।

তৃতীয় ফুঁক ঃ 'নফ্খে কেয়াম' অর্থাৎ হাশরের মাঠে উঠার ফুঁক।

এভাবে বলা যায় যে, প্রথম ফুঁকে কিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবকিছু মরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং তৃতীয় ফুঁকে সবাই জীবিত হয়ে উঠে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হবে। অতঃপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেন ঃ তখন দুনিয়ার অবস্থা হবে সেই নৌকাটির মতো, যা প্রচণ্ড তুফানের ঘুর্ণাবর্তে পড়ে ঢেউয়ের ঘাত প্রতিঘাতে ডুবু ডুবু হয়ে পড়েছে। অথবা সেই ঝুলন্ত বাতিটির মতো, যা বাতাসের ঝাপটায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। সেই সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে সেই প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ

www.pathagar.com

كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝

"কেয়ামতের সেই ভূকম্পনের দিন তোমরা দেখবে প্রত্যেক দুধদানকারী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকজনকে দেখবে তোমরা মাতাল। অথচ এই মাতলামী কোনো নেশার কারণে নয়। বরং আল্লাহর কঠিন আযাবে এই অবস্থা হবে।"

এখানে যে অবস্থার চিত্র অংকন করা হয়েছে তা হলো এই যে, কিয়ামতের মহাকম্পন যখন শুরু হবে, তখন মায়েরা তাদের আদরের সন্তান শিশুদের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কোনো মা'ই নিজের প্রিয় সন্তানের কি অবস্থা হচ্ছে সেদিকে এক বিন্দু খেয়াল করতে পারবে না। আর যাদের পেটে সন্তান রয়েছে কঠিন ভয়াবহতার কারণে তাদের গর্ভপাত হয়ে যাবে অথচ টের পাবে না। আর লোকজন নেশা করলে যেমন মাতাল হয়ে যায় সেরকম তারা মাতাল হয়ে যাবে।

কিয়ামতের এই মহাপ্রকম্পনের সময় মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টির যে অবস্থা হবে, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে তার চিত্র অংকিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

সূরা ক্বারিয়ায় আল্লাহ বলেন ঃ

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَاالْقَارِعَةُ ۝ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

"করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে তুমি কি জানো? সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো ছুটোছুটি করবে এবং পাহাড়-পর্বত ধুনিত রঙ্গীন তুলার মতো উড়তে থাকবে।" (ক্বারিয়া ঃ১-৫)

সূরা যিলযালে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ـ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ـ

www.pathagar.com

"যখন পৃথিবী ভীষণভাবে কেঁপে উঠবে, তখন উহা তার ভিতরের সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ (বের) করে দেবে এবং তখন মানুষ বলবে উহার কি হয়েছে?" (যিলযাল ঃ ১-৩)

সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ বলেন ঃ

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ٥ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ٥

"যেদিন যমীনকে (কঠিনভাবে) নাড়াছাড়া দেয়া হবে এবং পাহাড় রেণু রেণু হয়ে ধুলার মতো উড়তে থাকবে।" (ওয়াকেয়াহ ঃ ৪-৬)

সূরা হাক্কাহ্তে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ٥ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ٥ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥

"শিঙ্গায় যখন একটি ফূঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, তখন সেই বিরাট (কিয়ামতের) ঘটনাটি ঘটবে। (আল হাক্কাহ ঃ ১৩-১৪)

সূরা নাযিয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ٥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ٥ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ٥ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ٥

"যেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে। পরে দ্বিতীয় শিঙ্গা ধ্বনি হবে, সেদিন লোকদের দেল কেঁপে উঠবে এবং দৃষ্টিসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (নাযিয়াত ঃ ৬-৯)

আল্লাহ্ তাআলা সূরা মুজাম্মিলে বলেন ঃ

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ٥ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ -

"তোমরা যদি নবীর কথা অমান্য করো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ হতে, যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং যার কঠোর তীব্রতায় আসমান ফেটে যাবার উপক্রম হবে।(মুজাম্মিলঃ ১৭-১৮)

www.pathagar.com

কিয়ামতের দৃশ্য সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَا- اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ- وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ- وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-

"যে ব্যক্তি নিজ চোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো আত্ তাকভীর, আল ইনফিতার এবং আল ইনশিক্বাক সূরাগুলো পড়ে নেয়।" (তিরমিযী)

প্রিয় ভায়েরা, আমরা এবার এই তিনটি সূরায় কিয়ামতের দৃশ্য কিভাবে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন তা একবার পাঠ করে দেখি-

সূরা তাকভীরে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ٥ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ٥ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ٥ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ٥ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ٥ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٥

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্রসমূহ মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা (তার যায়গা থেকে) অপসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী (প্রিয়) উটনিকে ছেড়ে দেয়া হবে, যখন বন্য পশুরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উথাল-পাথাল করে তোলা হবে। (তাকভীর ঃ ১-৬)

আল্লাহ পাক সূরা ইনফিতারে বলেন ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ٥ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ٥ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ٥

"যখন (কিয়ামতের ভয়াবহতায়) আকাশ ফেটে যাবে, যখন নক্ষত্রসমূহ ছিটকে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। এবং যখন কবরগুলোকে খুলে দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কি আগে পাঠিয়েছে এবং কি পেছনে ছেড়ে এসেছে। (ইনফিতার ঃ ১-৫)

www.pathagar.com

সূরা ইনশিকাকে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ -

(কিয়ামতের প্রকম্পনে) যখন আকাশ ফেটে যাবে ও তার রবের আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত। অতঃপর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং জমিন তার গর্ভে যা আছে তার সবকিছুই (উপরে) নিক্ষেপ করে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে আর পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (ইনশিকাক ঃ ১-৫)

সম্মানিত ভায়েরা, কিয়ামতের শিঙ্গা ধ্বনির প্রথম কম্পনের ভয়াবহতার যে চিত্র তুলে ধরা হলো এতে মানব জাতির কেমন পরিণতি হবে তা বলা হয়েছে। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র এবং নদী-নালা, আকাশ, চন্দ্র-সূর্য এবং তারকারাজীর কি কি অবস্থা হবে তাও তুলে ধরা হয়েছে।

কিয়ামতের ভয়াবহতা সৃষ্টিকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত হযরত ইসরাফীল (আঃ) সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি পর পর তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক প্রদানের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর দায়িত্বের এলাটনেস এবং মানুষের করণীয় সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

كَيْفَ اَنْعَامُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَقَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاذَا تَأْمُرُنَا، قَالَ قُوْلُوْا "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" -

"কিভাবে আমি ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করতে পারি যেখানে শিঙ্গাধারী (ইসরাফীল আঃ) মুখে শিঙ্গা ধরে, কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে? লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো

www.pathagar.com

"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" অর্থাৎ আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক। (তিরমিযী)

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা, কিয়ামতের দৃশ্য সম্পর্কে সূরা হজ্বের ১ম দু'টি আয়াত থেকে যে দারস পেশ করলাম তা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো–

● কেয়ামত কবে হবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই।

● কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব সকলকেই ভোগ করতে হবে।

● যেহেতু কেয়ামত কবে হবে জানা নেই এ জন্য প্রতিটি মূহুর্ত আল্লাহ্ স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে।

● আখেরাতের চিরস্থায়ী কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে ডুবে না গিয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

● আল্লাহর বিধান সকল ক্ষেত্রে মানার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। এজন্য মুমিনের জিন্দেগীই হবে মজবুত ঈমান এবং জেহাদের জিন্দেগী।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা হজ্জের ১ ও ২ নং আয়াত থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আসুন আমরা কিয়ামতের সেই কঠিন ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর এবং তার রাসূলের বিধানকে মেনে চলার সবাই চেষ্টা করি। আমরা দারস থেকে যে শিক্ষা লাভ করলাম তা বাস্তব জীবনে মানার তাওফীক কামনা করে শেষ করছি।

www.pathagar.com

এগার

আনুগত্য-তাক্ওয়া-মজবুত ঈমান ও তার প্রতিদান

(সূরা আনফাল-১-৪)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۰ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۰ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۰ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۰

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে– (১) (হে রাসূল!) তোমার কাছে (তাঁরা) গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ? বলে দাও, এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন (সুদৃঢ়) করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো–যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (২) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই– যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণকালে ভয়ে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত তথা কালাম যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর আস্থা এবং ভরসা রাখে। (৩) তারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। (৪) এসব লোকেরাই হলো সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদা, অপরাধের ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَسْئَلُوْنَكَ – তোমাকে তারা জিজ্ঞেস বা প্রশ্ন করে।

www.pathagar.com

عَنْ - সম্পর্কে। اَنْفَالِ- অতিরিক্ত (গনীমত)। قُلْ- বলো বা বলুন। لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য। فَاتَّقُوا اللّٰهَ- অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। وَ- এবং। اَصْلِحُوْا- তোমরা সংশোধন করো। ذَاتَ- অবস্থা। بَيْنِكُمْ—তোমাদের মধ্যকার। اَطِيْعُوْا - তোমরা আনুগত্য করো। اِنْ- যদি। كُنْتُمْ- তোমরা হও। اِنَّمَا- প্রকৃতপক্ষে। اَلَّذِيْنَ- যারা। اِذَا- যখন। ذُكِرَ- اَللّٰهُ- আল্লাহর স্মরণ হয়। وَجِلَتْ- কেঁপে উঠে। قُلُوْبُهُمْ- তাদের অন্তর বা দেল। تُلِيَتْ - পাঠ করা হয়। عَلَيْهِمْ- তাদের নিকট। اٰيٰتُهٗ- তাঁর আয়াত বা কালাম। زَادَ - বৃদ্ধি। هُمْ اِيْمَانًا- তাদের ঈমান। عَلٰى- উপর। رَبِّهِمْ- তাদের রব বা প্রতিপালকের। يَتَوَكَّلُوْنَ -তারা নির্ভর বা ভরসা রাখে। يُقِيْمُوْنَ - কায়েম করে। الصَّلٰوةَ - নামায। رَزَقْنٰهُمْ- আমি তাদের রুযী দিয়েছি। يُنْفِقُوْنَ- তারা ব্যয় বা খরচ করে। اُوْلٰئِكَ- এসব লোক। هُمْ- তারাই। حَقًّا- প্রকৃত বা সত্যিকার। لَهُمْ- তাদের জন্য। دَرَجٰتٌ- উচ্চ মর্যাদা। عِنْدَ- কাছে বা নিকটে। رَبِّهِمْ- তাদের রবের। وَمَغْفِرَةٌ- এবং ক্ষমা। رِزْقٌ كَرِيْمٌ- সম্মানজনক রুযী।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফাল-এর ১-৪ নং পর্যন্ত মোট চারটি আয়াত তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

সূরার নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিও প্রতিকী বা চিহ্ন হিসেবে ১ম আয়াতে উল্লেখিত اَنْفَالُ শব্দটিকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।اَنْفَالُ শব্দটি نَفْلٌ (নফল)এর বহুবচন। যার অর্থ অতিরিক্ত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা 'গনীমত'। এই সূরাটির নাম শিরোনাম হিসেবে না হলেও এই সূরায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গনীমত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরাটি মাদানী। এই সূরাটি হিজরী দ্বিতীয় সনে প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। এতে ইসলাম ও কুফর-এর মধ্যে প্রথম সংঘটিত যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ভাষণটি এক সঙ্গেই নাযিল হয়েছে। তবে এটাও সম্ভব যে, এর কোন আয়াত বদর যুদ্ধজনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে

www.pathagar.com

পরে নাযিল হয়েছে এবং ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে তা সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপদান করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ মাদানী সূরা আনফালের পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরেকীন তথা অংশীবাদী এবং আহলে কেতাব তথা ইহুদী-নাসারাদের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরী, ফেৎনা-ফাসাদ এবং বিশৃংখলা সম্পর্কে আলোচনা এবং বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর বর্তমান এই সূরা আনফালে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের মুশরিক ও আহলে কিতাবিদের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও বিফলতা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয় ও সফলতা যা মুসলমানদের জন্য ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একান্ত কৃপা এবং কাফের মুশরিকদের জন্য ছিলো আযাব ও প্রতিশোধ স্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সব চাইতে বড় কারণ ছিলো মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রথমেই তাক্ওয়া-পরহেযগারী, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য, যিকির ও আস্থা এবং ভরসা প্রভৃতি নৈতিক বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এই সূরায় যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে শিক্ষামূলক কথা বলা হয়েছে। এই সূরায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গনীমতের বিলি-বন্টন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এই সূরায় যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কতকগুলি নৈতিক হেদায়াত দান করা হয়েছে। সূরার সর্বশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর দারস সহজে বুঝার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরার কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১-৪র্থ নম্বর পর্যন্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

মহান আল্লাহ্ সূরা আনফালের ১ম আয়াতে বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-

(হে রাসূল!) তোমার কাছে (তাঁরা) গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ? তুমি তাদেরকে বলে দাও, এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন তথা সুদৃঢ় করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো– যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

শানে নুযুল ঃ অত্র এই আয়াতটি মুসলমানদের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

www.pathagar.com

ঘটনাটি হলো এই যে, কাফের ও মুসলমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ বদরে যখন মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এলো, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে, যা নিঃস্বার্থতা– এখলাস ও ঐক্যের সেই উচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না, যার উপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরামের গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিলো। সেই জন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান দেয়া হয়, যাতে করে এই পুতঃপবিত্র এবং নিষ্কলুষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। যা মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) এর কাছে কোন এক লোক আয়াতে উল্লেখিত اَنْفَالُ (আনফাল) শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলাম তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়। সে ঘটনাটি ছিলো এই যে– গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের মাঝে সামান্য মতোবিরোধ হয়ে যায় যা আমাদের চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিলের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম (সাঃ) দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে করীম (সাঃ) বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমান ভাবে সেগুলো বিলি-বন্টন করে দেন।

ব্যাপার ঘটেছিলো এই– বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলের সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পিছন ধাওয়া করে যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের ফেলে যাওয়া মালামাল সংগ্রহ করতে থাকে। আর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশে এসে তাঁর হেফাজতে আত্মনিয়োগ করে। যুদ্ধ শেষ করে যখন সবাই একই স্থানে উপস্থিত হলো তখন যারা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলো– তারা বলতে লাগলো যে, এসব মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, সেহেতু এতে আমাদের ছাড়া আর কারো ভাগ নেই। অপর দল যারা শত্রুদের পিছন ধাওয়া করেছিলো তারা বললো, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী হকদার নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের গনীমতের মালামাল নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করার সুযোগ করে দিয়েছি। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সাঃ) এর হেফাজতের জন্য তাঁর কাছে ছিলো, তারা বললো, আমরাও

www.pathagar.com

তো ইচ্ছা করলে গনীমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নবীর হেফাজতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর হকদার। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের এসব কথা-বার্তা আল্লাহ্র রাসূলের কাছে পৌঁছলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব মাল-সামান আল্লাহ্ তাআ-লার। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া এর অন্য কেউ মালিক বা হকদার নয়; শুধু তাকে ছাড়া যাকে রাসূল (সাঃ) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মাল-সামান জেহাদে অংশগ্রহণকারী মোজাহীদদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (ইবনে কাসীর)।

গনীমত সংক্রান্ত এই বিধান নাযিল হবার পর সকল গ্রুপই আপন আপন দাবী প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ ও রাসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাজী হয়ে যায় এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তার জন্য সবাই লজ্জিত হন।

আসলে গনীমতের মাল সম্পর্কে সাহাবাদের মাঝে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো এটা তাদের ইচ্ছাকৃত কোন বিষয় ছিলো না। কেননা ইসলাম কবুল করার পর এটাই তাদের প্রথম যুদ্ধ এবং প্রথম বিজয়–এই কারণে যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ মাল-সামান কিভাবে বিলি-বন্টন হবে এটা তাদের জানা ছিলো না এবং এর কোন স্পষ্ট বিধানও ছিলো না। জাহেলিয়াতের যুগের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তারা গনীমতের মাল আপন আপন স্থানে থেকে দাবী করে বসেছিলো।

اَنْفَالُ (আনফাল) শব্দটি বহুবচন। একবচনে نَفْلٌ (নফল) বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ– অনুগ্রহ, দান, উপঢৌকন। ব্যবহারিক অর্থে نَفْلٌ (নফল) বলা হয় আবশ্যকীয় ও মূল পাওনার অতিরিক্ত জিনিসকে। নফল নামায, নফল রোজা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই نَفْلٌ (নফল) বলা হয়। এসব আমল বা কাজ যারা করে তারা নিজের খুশীতেই করে থাকে। কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় নফল ও আনফাল গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আল কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ (১) اَنْفَالُ(আনফাল) (২) غَنِيْمَةٌ (গনীমাত) এবং (৩) فَيْءٌ- (ফাই)। اَنْفَالُ শব্দটি তো এই আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর غَنِيْمَةٌ- (গনীমাত) শব্দ অত্র সূরার একচল্লিশ তম আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আর فَيْءٌ (ফাই) সূরা হাশরের ছয় নম্বর আয়াতে উল্লেখিত وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গনীমাত ঃ সেই সমস্ত মাল-সম্পদকে বুঝায়– যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে অর্জন করা হয়।

ফাই ঃ আর ফাই বলা হয় সেই মাল-সামানকে যা কোন যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেরেরা পালিয়েই যাক অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক।

আনফাল ঃ নফল বা আনফাল শব্দটি অধিকাংশ সময় এনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যা জেহাদের নায়ক বা প্রধান সেনাপতি কোন বিশেষ মুজাহিদ বা সৈন্যকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে।

গনীমাত এবং ফাই এর বন্টন পদ্ধতি ঃ

সাহাবীদের আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য এবং রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করার কারণে প্রথমে গণীমতের মাল-সামান আল্লাহ্ এবং রাসূলের বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্র এবং রাসূল (সাঃ) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। পরবর্তীতে অত্র সূরার ৫ম রুকুর ৩১ নম্বর আয়াতে উহা বন্টনের নীতি মালা বর্ণনা করা হয়েছে– যা এক কথায় বলা যায় গনীমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং বাকী চার ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহীদদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে।

আর 'ফাই' যেহেতু বিনা যুদ্ধেই ধন-সম্পদ অর্জিত হয়– সেইহেতু এর হকদার বা অধিকারী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। এই জন্য উহার সমস্ত সম্পদ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং যুদ্ধ জিহাদের কাজে ব্যয় ব্যবহার হবে।

আর 'আনফাল' শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকন অর্থেও ব্যবহার হয়– যা জেহাদের নেতা বা অধিনায়ক দান করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে– এতে আল্লাহ্ তাআলা রাসূলে কারীম (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তোমার কাছে লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, 'আনফাল' (গনীমাত) সবই হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী বা মালিক নয়। আল্লাহর নির্দেশক্রমে রাসূল (সাঃ) এসবের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন– তাই কার্যকর হবে। এখানে আর বিস্তারিত ভাবে অন্য কিছু না বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম পর্যায়েই আল্লাহ্র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার ভাবধারা পূর্ণত্ব লাভ করা

আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ তাআলা সাহাবাদের মধ্যে সাময়িকের জন্য যে সৌহার্দ্য ও ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল তা ফিরিয়ে পাবার জন্য ঘোষণা করেন–

www.pathagar.com

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো– যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

এই আয়াতাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনীমাতের মাল-সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবাদের মাঝে ঘটে গিয়েছিলো। আর তা পূরণের কেন্দ্রবিন্দু হলো তাক্ওয়া বা খোদাভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ (তাক্ওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে) তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন করো। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ **অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিনই হবে তাহলে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করো।** অর্থাৎ ঈমানের দাবীই হলো আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হলো তাক্ওয়া। কাজেই মানুষ যখন ঈমানের ভিত্তিতে আনুগত্য করে তাক্ওয়া অর্জন করতে সমর্থ হয়– তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা আপনিই দূর হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম-ভালবাসা ও সৌহার্দ্য।

অত্র সূরার ২য় এবং ৩য় আয়াতে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে তাক্ওয়া অর্জনকারী ঈমানদারদের পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ–

নিশ্চয়ই যারা মুমিন তারা এমন যে– যখন তারা আল্লাহর নাম যিকর বা স্মরণ করে তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর কালাম পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর আস্থা ও ভরসা রাখে।

এই আয়াতে মুমিনদের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ **যখন আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ হয় তখন তাদের অন্তর (ভয়ে) কেঁপে উঠে।** অর্থাৎ মুমিনদের অন্তর আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও প্রেমে পরিপূর্ণ, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। পবিত্র কুরআনের

www.pathagar.com

অন্য এক আয়াতে খোদাপ্রেমিকদের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে–

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

(হে নবী) তুমি সুসংবাদ দিয়ে দাও সে সব বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদেরকে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আলোচনা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে উঠে।

এই উভয় আয়াতে আল্লাহ্‌র আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে– তা হলো ভয় ও ত্রাস। অবশ্য অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌র স্মরণের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে –

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ আল্লাহ্‌র যিকর বা আলোচনার দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে– প্রশান্ত হয়।

এতে বোঝা যায় যে– আয়াতে যে ভয় বা ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়– যেমন জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তু বা শত্রুর দ্বারা মানুষের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা অন্তরে যে ভয় সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ এর পরিবর্তে وَجَلٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে– কোন ব্যক্তি যখন কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করে, আর তখনই আল্লাহ্‌র কথা তার স্মরণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে সে ভীত হয়ে নিজে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে ভয় অর্থে হবে আযাবের ভয়। (বাহরে মুহীত)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। সকল বিশেষজ্ঞ আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসের বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মতে– ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, সৎ কর্মের দ্বারা ঈমানীশক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি পয়দা হয়– যার প্রেক্ষিতে সৎ আমল বা কর্ম করা ঈমানদার মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর এই অভ্যাস পরিহার করতে গেলে মারাত্মক কষ্ট হয় এবং পাপ কাজের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘৃণা সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে "ঈমানের মাধুর্য্য" শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে মানুষের এ ধরনের মজবুত ঈমান থাকা সত্ত্বেও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পদস্খলন ঘটতেও পারে।

www.pathagar.com

এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে সদা সর্বদা দোআ করা উচিত ঃ
যেমন মহান আল্লাহ্ আমাদের দোআর ভাষা শিখিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! হেদায়াতের সঠিক পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিগড়িয়ে দিও না এবং তোমার অনুগ্রহ আমাদেরকে দান করো। তুমি তো সবকিছুর দাতা। (আলে ঈমরান-৮)

আমাদের আরো দোআ করা উচিত: যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) সর্বদা দোআ করতেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبُ سَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ **হে আমাদের অন্তরকে পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো** আল্লাহ্ রাসূল আরো দোআ করতেন :

يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبُ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ **হে আমাদের দেলকে উলট-পালটকারী, আমাদের দেলকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।** (মুসলীম)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আয়াতের সারমর্ম হলো এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ–বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ তথা তার হুকুম বা নিদর্শনাবলী উচ্চারিত হবে– তখনই তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎ কাজের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। অতএব কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে পড়া-অধ্যয়ন করা উচিত। অর্থ এবং ভাব না বুঝে শুধু প্রচলিত তেলাওয়াত করলে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ **আর তারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল তথা আস্থা ও ভরসা রাখে।**

আলোচ্য আয়াতাংশে মুমিনদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের যে কথা বলা হয়েছে তা হলো তারা সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, আস্থা রাখে। 'তাওয়াক্কুল' অর্থ হলো– আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ ঈমানদারেরা তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মে এবং সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উপরই পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে– তার অর্থ এই নয় যে, নিজের প্রয়োজনের জন্য পার্থিব উপকরণ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে– কেবলমাত্র পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং চেষ্টা-

www.pathagar.com

প্রচেষ্টাকেই যথেষ্ট মনে করবে না বরং নিজের সামর্থ, সুযোগ ও সাহস অনুযায়ী পার্থিব উপায়-উপকরণ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর সাফল্য আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে– যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপায়-উপকরণের ফলাফলতো তিনিই দেবেন। তবে মানুষের প্রকৃতগত অভ্যাস হলো যে, যে কোন কাজের ফলাফল তাড়াতাড়ি পেতে চায়। আর এর জন্যই তারা আল্লাহ্র উপর আস্থা হারিয়ে অন্য কিছুর দিকে ধাবিত হয়। এটা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। বরং ফলাফল লাভের জন্য ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ঃ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ আর তারা নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করে।

আয়াতের এই বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে– এখানে নামায পড়ার কথা বলা হয়নি। বরং নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। اِقَامَتٌ শব্দের আবিধানিক অর্থ হলো– কোন কিছুকে সোজা করে দাঁড় করানো। কাজেই اِقَامَتِ الصَّلٰوةَ এর অর্থ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা।

নামায প্রতিষ্ঠার দুটি অর্থ ঃ

প্রথম অর্থ ঃ তাফসীরকারক এবং মুহাদ্দীসগণ নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ করেছেন নামাযের বাইরের এবং ভিতরের যাবতীয় আহ্কামগুলো যথাযথ ভাবে পালন করা। নামাযের পূর্বে ও নামাযের ভিতরে যে সমস্ত আদব-কায়দা, রীতি-নিয়ম ও শর্তাবলী আছে তা এমন ভাবে সম্পাদিত করা, যেমন ভাবে রাসূলে কারীম (সাঃ) কথা ও বাস্তবতার মাধ্যমে বাতলিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ নামায কায়েমের দ্বিতীয় অর্থ হলো– সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাযকে প্রতিষ্ঠা করা। একটি ইসলামী সমাজে যখন সকলেই (নারী-পুরুষ) নামায পড়বে তখনই কেবল নামায প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা যাবে। কেননা নামায কায়েম করার দায়িত্ব হলো– ইসলামী রাষ্ট্রীয় সরকারের। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, তখন সে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। (সূরা হজ্জ-৪১)

নামায যখন আমলের পদ্ধতির দিক থেকে এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তখনই প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ নিশ্চয়ই নামায

www.pathagar.com

সকল প্রকার অশ্লীলতা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আর যখনই সমাজের লোক নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে তখনই গোটা সমাজ ব্যবস্থা সংশোধিত হয়ে যাবে। তখন মানুষ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ঃ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ **এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌ পথে) খরচ করে।**

প্রকৃতি মুমিনের পঞ্চম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যে রিযিক বা জীবিকা দিয়েছে তা থেকে তারা আল্লাহ্‌র পথে তথা আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে খরচ করে। আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যখন যা প্রয়োজন তারা তাদের অর্জিত সম্পদ থেকে খরচ করতে থাকে, কার্পণ্য করে না, কত দান করলো তাও হেসাব করে দেখে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভের আশায় তারা সৎ নিয়তে খরচ করতে থাকে। তাছাড়া তারা শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফেতরা আদায় করে এবং দান-খয়রাত সহ মানুষের কল্যাণে সাহায্য-সহযোগীতাও করে থাকে। পরবর্তী আয়াতে মুমীনদের বৈশিষ্ট্যের স্বকৃতিস্বরূপ প্রতিদানের কথা ঘোষণা করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا–

তারাই হলো প্রকৃত ঈমানদার। এই আয়াতে উপরে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঈমানদারদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দান করে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঈমানদার লোকেরাই হলো প্রকৃত এবং সত্যিকারের ঈমানদার। এ থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র কালেমার স্বীকৃতি মুখে মুখে দিলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না, তার বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিফলন আবশ্যক। মুখে স্বীকৃতি এবং বাস্তব প্রয়োগে যদি মিল না হয় তাহলে তাদেরকে মুনাফিকদের আচরণের সাথে তুলনা করে মহান আল্লাহ্ সূরা সফ্-এর ২-৩ আয়াতে উল্লেখ করে বলেন ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ـ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ–

তোমরা সেকথা কেন বলো যা তোমরা বাস্তবে আমল বা প্রয়োগ করো না। এটা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত গর্হিত কাজ যে, তোমরা যা বলো তা তোমরা করো না।

প্রকৃত মুমিনদের মর্যাদা ও প্রতিদান ঃ

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

www.pathagar.com

তাদের জন্য তাদের রবের পক্ষ থেকে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং উত্তম রিযিক।

আয়াতের এই অংশে এবং দারসের সর্বশেষ অংশে মহান আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত গুণ ও বেশিষ্ট্যের অধিকারী লোকদের সত্যিকারের ঈমানদার স্বীকৃতি প্রদান করে তার স্বীকৃতি স্বরূপ এতে তিনটি প্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে– (১) সুউচ্চ মর্যাদা (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তাফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে– এর পূর্ববর্তী আয়াত দু'টিতে মুমি-নদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন প্রকৃতির (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন– ঈমান, খোদাভীতি, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বা আস্থা। (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন– নামায, রোযা প্রভৃতি এবং (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে যেমন– আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা।

উপরোক্ত এই তিনটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এক. আত্মিক গুনাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা' দুই. যেসব আমল বা কর্ম মানুষের দেহের সাথে সম্পর্কিত সেসব আমল বা কর্মের জন্য 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা যেমন– নামায, রোজা, জিহাদ ইত্যাদি এবং তিন. যার সম্পর্ক সম্পদের সাথে সে সমস্ত সম্পদ খরচের জন্য রয়েছে সম্মানজনক রিযিক। মুমিন আল্লাহ্‌র পথে যা ব্যয় করবে, পরকালে সে তার চেয়েও বহুগুণ উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সূরা আনফালের প্রথম চারটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায় তা হলো ঃ

- আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে আত্মনিয়োগ করা। প্রয়োজনে বদরের যুদ্ধের মতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

- ভবিষ্যতে যদি বদর যুদ্ধের ন্যায় কোন গনীমতের মাল-সম্পদ হস্তগত হয় তবে তার লোভে পড়ে যেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য লংঘিত না হয়। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কিংবা রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য পাওয়া গেলে বৈষয়িক কোন কিছু পাবার আশায় হন্যে হয়ে ছুটে না বেড়া এবং বেশী বেশী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়া।

- প্রতিটি মুমিনের উচিত সদা-সর্বদা সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করা, আল্লাহ্‌র ভয়েই সকল বৈষয়িক স্বার্থ, অন্যায়-অপকর্ম এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

- ইসলামী আন্দোলন করতে যেয়ে যদি কোন কারণে কোন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য হয় কিম্বা তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং

www.pathagar.com

পরকালের কল্যাণের আশায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করে নেয়া।

❑ নিজের পক্ষে হোক আর বিপক্ষেই হোক মুমিনদের সকল অবস্থায় আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশকে মান্য করে চলা।

❑ আল্লাহ্র প্রেম এবং ভীতি সৃষ্টির জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ্র ক্ষমতা, মর্যাদা, মাহাত্ম এবং বড়ত্বের কথা স্মরণ করা। যাতে করে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে আল্লাহ্ বিমুখ না হয়ে যায়।

❑ ঈমানের মাধুর্য্য এবং মজবুতির জন্য আল্লাহ্ তাআলার আয়াত সমূহ বুঝে তেলাওয়াত বা পাঠ করা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে অনুধাবন করা।

❑ নিজের যোগ্যতা এবং বৈষয়িক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সার্বিক ভাবে চেষ্টা সাধনা করা এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা রাখা। কেননা চেষ্টা-চরিত্র না করে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা প্রকৃত তাওয়াক্কুল নয়।

❑ প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদারের স্বীকৃতি পেতে হলে বৈষয়িক স্বার্থ ত্যাগ করা, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য করা এবং নির্দেশ সমূহ মান্য করা, সকল অবস্থায় আল্লাহ্র ভয় অন্তরে রাখা, সকল সময় ও সকল অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করা, আল্লাহ্র কালাম বুঝে পড়া এবং অনুধাবন করা, সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর আস্থা ও ভরসা রাখা, নামায কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজের জীবিকা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করা।

❑ উপরোক্ত আমল বা কর্ম সম্পাদন করতে পারলে মহান আল্লাহ্ পাক উভয় জগতে সম্মানজনক মর্যাদা দান করবেন। ঘটে যাওয়া অপরাধ মাফ করে দেবেন অথবা সৎ কাজের কারণে অন্যায় কাজগুলো উপেক্ষা করবেন এবং উভয় জগতেই সম্মানজনক এবং বেশী বেশী রুযী দান করবেন।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আনফালের ১-৪ আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ কালাম এতে যদি আমার অজান্তে ভুল অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর অত্র দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করে উভয় জগতে সফলতা লাভ করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

——— ঃ সমাপ্ত ঃ ———

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

www.pathagar.com